বেদান্তপ্রবেশ।

আবশ্যকীয়

বিবিধ শাস্ত্রীয় বিবরণের সহিত।
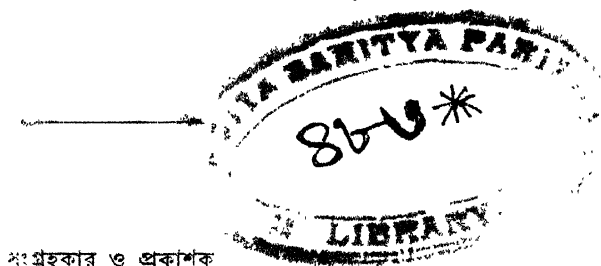
সংগ্রহকার ও প্রকাশক

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

গুপ্তপ্রেশ

২৪, মীর্ জাফর্স লেন, কলিকাতা।

১২৮২

বেদান্ত প্রবেশ।

গাম্ভীর্য্যন্দধতী সতী বসুমতী রক্ষাং সমাতন্বতী
দানৈঃ কল্পলতামধঃকৃতবতী শুভ্রংযশোবিভ্রতী।
শ্রীলক্ষ্মীশ্বরসিংহভুপজননী বৈদেহদেশেশ্বরী।
শ্রেয়ঃশ্রীসহিতা মহেশ্বরলতা দেবী চিরং রাজতে॥ ১
তস্যাঃ সেবনৎপরেণ বিভবং সংপ্রাপ্য পূর্ণংততঃ
তূর্ণং শ্রীবসুচন্দ্রশেখরইতি খ্যাতেন নত্বা হরিম্।
সম্যগ্বীক্ষ্য মতানি দর্শনকৃতাং বিজ্ঞায় তত্ত্বং পুনঃ
গ্রন্থোয়ং পরমার্থবোধফলকোনির্ম্মায় সম্মুদ্রিতঃ॥ ২

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

নির্ঘণ্ট।

ভূমিকা।

১। বেদান্ত-শাস্ত্র ভারতবর্ষে অতি মান্য। পরমেশ্বরের জ্ঞান যে প্রকার সূক্ষ্ম, জীবাত্মার ভাব যেরূপ অতীন্দ্রিয়, জীবাত্মা স্বীয় জন্মদাতা পরমেশ্বরের যেরূপ আশ্রিত, সংসার যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল, এই সকল পরমার্থ-তত্ত্ব দ্বারা বেদান্ত-শাস্ত্র পরিপূরিত। তেমন এক খানি পরম শাস্ত্র, আসিয়া, ইওরোপ, আফ্রিকা, এমেরিকা, ধরণীর এই চারি খণ্ডের কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীসদেশীয় দর্শন-সমূহ, ইদানীর ইওরোপীয় কতিপয় দর্শন, এমেরিকার একে-শ্বরবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থ সকলের যদিও স্থলবিশেষে বেদান্তের সহিত ঐক্য হয়, কিন্তু তাহা বেদান্তের ছায়া ভিন্ন স্বরূপ নহে। এই অদ্বিতীয় মহাশাস্ত্র ভারত-সরস্বতীর কমনীয় কলেবরের সুদৃঢ় অস্থিস্বরূপ, ভারতীয় পরমার্থ-বিদ্যা-সরোজিনীর হৃদয়-নিহিত-মকরন্দ-স্বরূপ এবং ভারতীয় শাস্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ দিগ্‌-বিজয়ী বীরপুরুষগণের হস্তের তীক্ষ্ণ অসি ও অভেদ্য বর্ম্ম সদৃশ।

২। যাঁহারা যৌবন ও বিদ্যাভিমানসুলভ মত্ততা সহ-কারে সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কারণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বা উপাসনা অস্বীকার করেন, তাঁহারা যদি বেদান্তশাস্ত্রকে অমান্য করেন তাহা শোভা পায়। কিন্তু যে সকল বিদ্বান্ আপনারদিগকে

ভগবৎভক্ত বলিয়া জানেন, তাঁহারদিগকে তদ্রূপ আচরণ করিতে দেখিলে দুঃখ হয়। তাঁহারা অনেকে জানিয়া রাখিয়াছেন যে, বেদান্তশাস্ত্র কেবল কতিপয় অলীক, শুষ্ক, ও বিকৃত তর্কে পূর্ণ; এবং যাঁহারা তাহা লইয়া আলোচনা করেন তাঁহারা বাতুল। এই প্রকার লোকের সংখ্যাই এখন অনেক। সুতরাং ক্রমে ক্রমে এই পরমোপকারী শাস্ত্রখানি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

৩। পক্ষান্তরে বৈদান্তিক জ্ঞানালোচনায় যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, উপযুক্তরূপ পুস্তকাভাবে তাঁহাদের ইচ্ছা ফলবতী হইতেছে না। অনুবাদের সহিত যে কয়েকখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে, তাহা সকলের বোধগম্য নহে। তাহাতে কেবল মূলের অনুবাদ মাত্রই আছে, তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কালোচিত যুক্তিযুক্ত কোন প্রকার তাৎপর্য্য বা টীকা তাহাতে সংলগ্ন নাই। ফলতঃ সেরূপ তাৎপর্য্য ব্যতীত অত প্রাচীনকালের বিচারপ্রণালী ও বৈদিক উপমা সকল ভেদ করিয়া শাস্ত্রার্থের অবগতি সম্ভব নহে। বিশেষ, ইংলণ্ডীয় বিদ্যাপ্রভাবে অনেকের চিন্তাপ্রণালী যে প্রকারে প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ঈশ্বর, জীব, সংসার, উপাসনা ও পরলোক সম্বন্ধে অনেকের যে প্রকার সামান্য বোধ জন্মিয়া আছে, যত দিন সম্ভবমত সেই প্রকার চিন্তাপ্রণালী ও সামান্য বোধকে উপকরণ করিয়া বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা না করা যাইবে, তত দিন, বেদান্তশাস্ত্রের দুর্লভ উপকারে, ইচ্ছাসত্ত্বেও, অনেকে বঞ্চিত থাকিবেন।

৪। এখন যে প্রকার সময় উপস্থিত, তাহাতে অনেক লোক কোন শাস্ত্র পাঠের পূর্ব্বে তাহার বর্ণিত বিষয়টি অগ্রে

ইতিহাসের ন্যায় জানিতে চান। ঐ প্রকার ইচ্ছাকে কিয়ৎ-পরিমাণে চরিতার্থ করা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবেনা যে, যে ব্যক্তি কখন অম্রের মধুরতা আস্বাদন করে নাই, তাহাকে যদি বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় যে, অম্রের আস্বাদ মধুর ন্যায়; ভাবিয়া দেখ, বিস্তর প্রভেদ রহিল। তথাপি মধুপানে যাঁহার চিত্তমধুপ লালায়িত আছে, তাঁহার নিকটে অম্রকে মধুর ন্যায় বলিয়াই পরিচয় দেও, তাহাই তাঁহার পক্ষে অম্র আস্বাদন করিবার পরমোৎসাহ স্বরূপ হইবেক।

৫। যাঁহারা বেদান্ত পাঠের পূর্ব্বে, তাহার বিবরণ জানিতে চান, তাঁহারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য আমি বেদান্ত-প্রবেশ নামক এই সামান্য সংগ্রহ উপস্থিত করিতেছি। বেদান্তের যে মনোহারিতা তাহা বেদান্তেই আছে, যাঁহার রসনাতে সে মধুর রসের সংযোগ হইবেক, বেদান্ত কি বস্তু তাহা তিনিই অনুভব করিবেন। এই সংগ্রহ তৎপক্ষে কেবল উৎসাহ স্বরূপ। ইহাতে কতই না জানি ভ্রম প্রমাদ আছে। মহাত্মাগণ যদি সে সকল দেখাইয়া দেন ও তদনুসারে ইহা সংশোধন করিতে পারি, তবে আমার আশা সফল ও সত্যের সম্মান রক্ষা হইবেক। পক্ষান্তরে যাঁহাদের প্রধান প্রধান শাস্ত্রের বিবরণ অথবা পারমার্থিক বার্ত্তা ভাষাতে জানিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের মধ্যে এক জনও যদি এই সংগ্রহ হইতে বেদান্ত-পাঠের উৎসাহ ও সাহায্য পান তবে আমি কৃতার্থ হইব।

৬। বেদশাস্ত্র হইতেই বেদান্তশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে এবং বেদাঙ্গ ও দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গেও উহার সম্বন্ধ আছে। এজন্য আমি অগ্রে সেই সকল শাস্ত্রের সার সার তাৎপর্য্য

বলিব। পশ্চাৎ বেদান্তশাস্ত্রের অপেক্ষাকৃত বিশেষ বিবরণ দ্বারা তাহার জ্ঞানলাভের উপায় নিবেদন করিব। ইতি।—

মিথিলা, দ্বারভাঙ্গা
৩ শ্রাবণ ১৭৯৫ শক।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

ও তৎসৎ
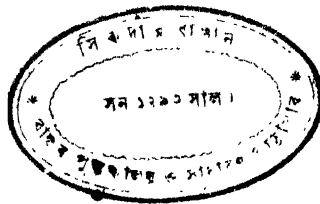
বেদান্ত প্রবেশ।

বেদ।

৭। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ, প্রত্যেকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত; মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্র ভাগের আর এক নাম সংহিতা। মন্ত্রভাগ প্রায় ছন্দে রচিত এবং অতি প্রাচীন। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ-সংহিতার ন্যায় প্রাচীন কীর্ত্তি আর পৃথিবীতে নাই। ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রভাগের উত্তরকালে এবং তাহার কিয়দংশ লিপিবিদ্যা সৃষ্টির পূর্ব্বে ও কিয়দংশ সম্ভবতঃ লিপিবিদ্যা সৃষ্টি হইলে পর* প্রকাশিত হয়। উহা প্রায় গদ্যে রচিত এবং উহা প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বা উহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদ-প্রণালী স্থাপিত হইয়াছিল। ভাষাগত এবং দেবতাগত বৈলক্ষণ্য, মন্ত্রভাগের সহিত ব্রাহ্মণভাগের কাল-বিভিন্নতার পরিচয় দিতেছে। অপরঁ, উক্ত বৈলক্ষণ্য ইহাও স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে যে, মন্ত্রযুগের অপেক্ষা ব্রাহ্মণযুগে ভারতবর্ষে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সামাজিকতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। মন্ত্রভাগ ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদের সরল স্তুতিবাদ ও যজ্ঞীয় মন্ত্রে পূর্ণ। কোন কোন স্থানে পরব্রহ্মের উদ্দেশে

* লিপির সৃষ্টির পর ব্যতীত গদ্য রচনা সম্ভব হয় না।

স্পষ্টতঃ বা অস্ফুটভাবে দুই একটি স্তুতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণভাগের প্রকৃতি সেরূপ নহে। ব্রাহ্মণভাগ অধিকাংশতঃ সংহিতা-ভাগের ভাষ্যস্বরূপ। ব্রাহ্মণের সংখ্যা অনেক। এক এক খানি ব্রাহ্মণ এক এক শাখান্তর্গত। বেদসংহিতার অন্তকালে ব্রাহ্মণ জাতি তাদৃশ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক বেদের সংহিতা-ভাগের সহিত সেই সেই বেদের ব্রাহ্মণ শাস্ত্র সকল সংযুক্ত। ব্রাহ্মণ-খণ্ডসমূহে যাগ যজ্ঞের রীতি, পদ্ধতি, যজ্ঞীয় কাল ও ফল শাখানুসারে প্রকাশিত আছে। তাহার মধ্যে নানা পুরাণের মূল আখ্যায়িকা সকল অতি সংক্ষেপে ইতস্ততঃ বর্ণিত দেখা যায়। সৃষ্টির বিবরণ, ব্রহ্ম, জীব ও প্রকৃতির বিচারও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ আরণ্যক ও উপনিষৎ সমূহ ব্রাহ্মণ-খণ্ডসমূহেরই অংশ স্বরূপ। উপনিষৎ সকল বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অংশ, এজন্য তাহার নাম বেদ-শিরোভাগ। উপনিষৎসমস্ত বেদের অন্তে স্থিত, এজন্য তাহার সাধারণ নাম বেদান্ত। যদিও সংহিতা-ভাগ লিপিবিদ্যার অভাবে সনাতন হইতে শ্রুত হইয়া আসায় প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রুতি নামের যোগ্য, কিন্তু প্রচলিতরূপে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ বেদই শ্রুতি শব্দের বাচ্য। "শ্রুতিস্তুবেদো বিজ্ঞেয়ঃ" বেদকেই শ্রুতি বলিয়া জানিবে।—মনু ২। ১০।

৮। চারি বেদের মন্ত্র-অংশে দেবতাদের যজ্ঞবন্দনা-প্রতিপাদক কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতির ভাগই অধিক। তাহাতে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি অতি অল্প এবং সে অল্পও অধিকাংশতঃ অস্পষ্ট। ঐরূপ, ব্রাহ্মণ-খণ্ডসমূহেও কর্ম্মকাণ্ডীয়

শ্রুতিই অধিক, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি অল্পমাত্র। কিন্তু উপনিষৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির ভাণ্ডার। তাহাতে অতি অল্পসংখ্যক অস্পষ্ট শ্রুতি দৃষ্টিগোচর হয়। উপনিষদে কর্ম্ম-কাণ্ডীয় শ্রুতিও বিরল। কেবল দুই একটি, উপমাচ্ছলে বা প্রসঙ্গাধীন উত্থাপিত হইয়াছে। বরং উপনিষৎ-শাস্ত্রেই বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ড নিতান্ত হেয় ও বন্ধনের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে।

৯। শাস্ত্রে কোন স্থানে বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেয়, কোথাও বা ঈশ্বরপ্রণীত বলেন। সেরূপ উক্তির তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। মানবের অধিকার ও রুচিবৈচিত্র্য জন্য মুখ্য ও গৌণ এই দ্বিবিধ বৈদিক উপাসনা ও তদনুযায়ী আচার স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন ঋষি বা জ্ঞানী বুদ্ধিপূর্ব্বক বেদ রচেন নাই। কেবল ঋষিগণের স্বাভাবিক ঈশ্বরগত অনুরাগই নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মার্গ বিশিষ্ট বৈদিক ধর্ম্মকে প্রসব করিয়াছে। সে অনুরাগ তাঁহাদের পুরুষব্যাপারের মধ্যগত নহে। ঈশ্বরও স্বকীয় ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান-জন্য-প্রবৃত্তি-বশতঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক বেদের স্রষ্টিকর্ত্তা নহেন। কারণ, যদিও ঈশ্বর, ঋষিদিগের তদ্গত-বুদ্ধি ও অনুরাগে কূটস্থ ও বিধাতা রূপে বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু তাদৃশ অনুরাগ-রূপ যে একটি স্বাভাবিক কার্য্য, তাহাতে তিনি কর্ত্তা রূপে লিপ্ত ছিলেন না; সুতরাং তিনিও বুদ্ধিপূর্ব্বক বেদের কর্ত্তা নহেন। এতাবতা আদিপুরুষস্বরূপ ঈশ্বর অথবা সৃষ্টপুরুষ-স্বরূপ জীব, এ উভয়ের কেহই বুদ্ধিপূর্ব্বক বেদ প্রকাশ করেন নাই। অতএব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বেদ অপৌরুষেয়।

১০। নিদ্রাবস্থায় যে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় তাহা যেমন স্বাভাবিক ও পুরুষবুদ্ধির অকৃত; মানব, ঈশ্বরের আবির্ভাব ও বিভূতি, অগ্নিতে, জলেতে, বিশ্ব-ভুবনে ও নরপ্রকৃতিতে দৃষ্ট করিয়া অনুরাগ ও প্রেমবশে তত্তদবলম্বনে তাঁহার পূজার উদ্দেশে যে স্তুতিবন্দনা উচ্চারণ করেন তাহাতেও তাঁহার সেইরূপ কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তাদৃশ স্থলে তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক উত্তেজনাই ঐ প্রকার স্তুতিবন্দনার হেতু, এবং ব্রহ্মই তাহার লক্ষ্য। সেই সকল স্তুতিবন্দনা স্বতঃসিদ্ধ। বেদ তাদৃশ ঋচ্ সমূহের সংহিতা মাত্র, সুতরাং বেদও স্বতঃসিদ্ধ। মহর্ষি কপিল কহিয়াছেন "নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যং" (কপিলসূত্র ৫।৫১।) বেদ নিজ শক্তিতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং আপনিই আপনার প্রমাণ?। ফলতঃ ঈশ্বরের পূজা কখন তর্ক বা বুদ্ধির ফল নহে। অতএব বেদকে মনুষ্যের কৃত বলা সঙ্গত হয় না। তবে মনুষ্যের নিত্যস্বভাবজ বলিতে পার। কিন্তু সেই নিত্যস্বভাবের নিয়ন্তা ঈশ্বরই। কিন্তু ঈশ্বরের তাদৃশ নিয়ন্তৃত্বে তাঁহার বুদ্ধির কৌশল নাহি, তাহাও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। এই হেতু বেদকে নিত্য অথচ ঈশ্বর হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাসবৎ উৎপন্ন বলিতে পার। এ স্থলে "নিত্য" শব্দের গৌণ প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। এতাবতা মীমাংসা এই যে পুরুষবুদ্ধির অকৃত বিধায় বেদ অপৌরুষেয়, মানবের নিত্য-স্বভাব-নিহিত বিধায় উহা নিত্য, এবং ঈশ্বর সেই স্বভাবের নিয়ন্তা বিধায় উহা ঈশ্বর-প্রণীত, কি না নিশ্বাসবৎ তাঁহার শক্তি হইতে নির্গত। যত কাল মানবস্বভাব বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভরূপে তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিবেনই।

তত কাল যাবৎ এই দুয়ের যোগে পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্তুতি-বন্দনা উঠিবেই। তাহা নিত্যসিদ্ধ। বেদ সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। বিশেষ এই যে, ঈশ্বরের সন্নিধানে মানবস্বভাবের যতপ্রকার ভাব গতিক হইতে পারে, বেদের মধ্যে সে সমুদয়েরই পরিচয় আছে; অতএব স্বাভাবিক-সনাতন-ধর্ম্ম-সন্ধিৎসু জনগণের পক্ষে বেদ অতি পবিত্র শাস্ত্র।

১০ (ক)। শাস্ত্রে যখন বেদকে এইরূপ নিত্য কহেন, তখন এক বেদ অপেক্ষা অন্য বেদ প্রাচীন এইরূপ ব্যবহার কি মতে হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, বেদশাস্ত্র স্বর্গ হইতে লিখিত হইয়া ধরণীতে আসে নাই, পরমেশ্বরও মর্ত্ত্যে আসিয়া উহা লিখিয়া দেন নাই। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ঋষির নিকট বিধাতার নিয়মিত স্বভাব হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা কিছু এক দিনে হয় নাই। সুতরাং বেদের অগ্র পশ্চাৎ প্রকাশ সম্বন্ধে কালবিভিন্নতা অযুক্ত নহে। তাহাতে শাস্ত্রের বিরোধ নাই।

১১। সমগ্রবেদশাস্ত্র প্রকাশের পর শত শত বর্ষ গত হইলে, ক্রমে তাহা লোকসমাজে পুরাতন হইয়াছিল। নানা-শাখার অধীনে, সংহিতা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবাতে তাহার বহুভাগ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। এতাদৃশ সময়ে বেদশাস্ত্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও লুপ্তপ্রায় অংশ সকল একত্রে সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। শ্রীমদ্ভগবান্ ব্যাসদেব ঐ সকল খণ্ড অংশ একত্রিত করিয়া যথোপযুক্তরূপে ঋক্, যজুঃ, সামাদি ভাগে বিভক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আর্য্যকুলের ঐ অভাব পূরণ করিলেন।

১২। বেদ ঐপ্রকারে একত্রিত ও শ্রেণীবদ্ধ হওয়াতেও আঁদৌ মন্ত্রকাণ্ডের ভাষার প্রাচীনতা, ও কালক্রমে তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনার হ্রাসতা বিধায়, তাহার তাৎপর্য্য লোকের নিকট দুর্ব্বোধগম্য থাকিল ; দ্বিতীয়তঃ বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মের যজন যাজনে নানাপ্রকার অজ্ঞানতা উপস্থিত হইল; তৃতীয়তঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াও নানা বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। এই সময়ে বৌদ্ধেরা আবির্ভূত হইয়া মন্ত্র ও ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মের ও ব্রহ্মজ্ঞানের অসারত্ব প্রকাশ করতঃ ব্রহ্মোপাসনা ও ধর্ম্মকার্য্য সকল লোপ করিতে বসিল। এমত দুরবস্থার সময়ে তৎকালীন জনসমাজের বিদ্যা বুদ্ধি ও অধিকার অনুযায়ী একটি নবতর প্রণালীদ্বারা তখনকার বিজ্ঞ ঋষিগণ বৈদিক আচার ব্যবহার ও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হইলেন।

সূত্রগ্রন্থ।

সাধারণ প্রকৃতি।

১৩। যে সমস্ত শাস্ত্রদ্বারাঐ প্রকার সুমহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল তাহার নাম সূত্রগ্রন্থ। এই সকল সূত্রগ্রন্থই বৈদিক ভাষা, বৈদিক ছন্দঃ, বৈদিক ইতিহাস, বৈদিক ক্রিয়া, বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান জানিবার ও বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান করিবার পক্ষে

বিশেষ উপযোগী। প্রত্যেক সূত্রগ্রন্থ কেবল কতিপয় সূত্রের সমষ্টি। সূত্র সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যমাত্র। এ সকল গ্রন্থে শ্লোকের ন্যায় ছন্দে কোন প্রকার বচন নাই। শব্দের স্বল্পতা-নিবন্ধন টীকা-সাহায্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না। তাহা বুঝিবার নিমিত্তে অসাধারণ বিচার শক্তি, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, সিদ্ধান্ত বিষয়ক প্রণালীজ্ঞান এবং ব্যাকরণের বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন করে। সূত্র সকল এক একটি বিষয়ের অধীনে পরস্পর সম্বন্ধাধীন। কোন একটী বিচার্য্য বা বর্ণিত বিষয়ের সহিত যতগুলি সূত্র সম্বন্ধ রাখে তাহাকে অধিকরণ কহে। প্রত্যেক অধিকরণের পাঁচ পাঁচটি অঙ্গ আছে। যথা বিষয়, সংশয়, সঙ্গতি, পূর্ব্বপক্ষ, এবং উত্তর-পক্ষ। একটি অধিকরণে যে নিয়ম স্থাপিত হয় তদ্দারা পরবর্ত্তী এক বা অধিক অধিকরণ শাসিত হইয়া থাকে। নিয়মের এই প্রকার শাসনকে অনুবৃত্তি ও তাহার বিরামকে নিবৃত্তি কহে। এইরূপ অনুবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে সূত্রগ্রন্থ সকল বুঝা যায়না। এই সমস্ত গ্রন্থের আশ্চর্য্য প্রকৃতির তুলনা ভারতীয় অন্য কোন শাস্ত্রে এবং অন্য কোন দেশের কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এইরূপে অতি সংক্ষেপ প্রণালীতে এক এক খানি সূত্রগ্রন্থ স্বকীয় বর্ণনীয় বা বিচার্য্য শাস্ত্র বা বিষয়কে জনসমাজের উপকারার্থে প্রচার করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল সূত্রগ্রন্থের সংখ্যা উত্তরোত্তর অনেক হইয়াছিল এবং তৎসমূহ সরংচিত হইতে শত শত বর্ষ গত হইয়াছিল। সেই শত শত বর্ষ-সমষ্টিকে সূত্র যুগ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বেদ সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ সমূহই শ্রুতিনামে প্রসিদ্ধ। সূত্রগ্রন্থ সকল শ্রুতিমূলক বটে, কিন্তু তৎসমূহ

শ্রুতি বলিয়া পরিগণিত নহে। কিন্তু বেদের জ্ঞানলাভার্থে সূত্রগ্রন্থ সমূহ অতিমাত্র প্রয়োজনীয়।

১৪। বুঝিবার সুবিধার নিমিত্তে "বেদাঙ্গ সূত্র" ও "দর্শন সূত্র" এই দুইটি সাধারণ শিরোনামের দ্বারা নিম্নে সংক্ষেপে সূত্রগ্রন্থ সমূহের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

বেদাঙ্গসূত্র।

১৫। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এই ষড়্বিধ শাস্ত্র বেদাঙ্গনামে প্রসিদ্ধ। এসকল শাস্ত্র আদৌ ব্রাহ্মণযুগে সংক্ষেপে আরব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ-খণ্ড-সমূহের অংশ স্বরূপে অপরিস্ফুটভাবে অবস্থিত ছিল। পশ্চাৎ সূত্রগ্রন্থে তাহাই বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৬। বেদাধ্যয়নের সুবিধার নিমিত্তে শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এই চতুর্ব্বিধ ভাষাবিজ্ঞান সৃষ্ট হয়।

১৭। শিক্ষাশাস্ত্রের আর এক নাম প্রাতিশাখ্য। প্রত্যেক শাখায় এক এক প্রকার শিক্ষাশাস্ত্র ছিল বলিয়া উহার সাধারণ নাম প্রাতিশাখ্য হইয়াছে। বর্ণ, স্বর প্রভৃতির উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়াই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এ পর্য্যন্ত কেবল চারিখানি শিক্ষাশাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। যথা, ঋগ্বেদের শাকল শাখান্তর্গত শৌনককৃত শাকল প্রাতিশাখ্য, যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য, কাত্যায়নকৃত বাজসনেয়ী শাখার অন্তর্গত মাধ্যন্দিন-প্রাতিশাখ্য এবং অথর্ব্ববেদীয় চতুরাধ্যায়িক প্রাতিশাখ্য।

১৮। বেদাঙ্গীয় ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনিই শেষ এবং সম্পূর্ণ ব্যাকরণ শাস্ত্র। যাঁহারা পাণিনি পাঠ করেন তাঁহারা পাণিনির ব্যবহৃত উপমা ও দৃষ্টান্ত সমস্ত হইতে বিস্তর বৈদিক জ্ঞান লাভ করেন। পাণিনির তুল্য সারবান্ ব্যাকরণ পৃথিবীতে আর নাই। পাণিনির পূর্ব্বে মাহেশ,* উণাদিসূত্র, কীটসূত্র নামে আর তিন খানি ব্যাকরণ ছিল। বোধ হয় সে তিন খানিই লোপ হইয়াছে। †

১৯। নিরুক্তশাস্ত্র শব্দকোষ মাত্র। তাহাতে বৈদিক-শব্দ সকলের অর্থ ও ধাতু নিরূপিত আছে। যাস্ককৃত নিরুক্তই জানিত।

২০। ছন্দশাস্ত্রে বৈদিক ছন্দঃ সকলের বিবরণ আছে। পিঙ্গলনাগের ছন্দঃগ্রন্থই প্রধান। অপর, শৌনককৃত শাকল প্রাতিশাখ্যের মধ্যেও ছন্দোধ্যায় আছে। যাস্ক ও সৈতব প্রণীত আর দুইখানি ছন্দঃশাস্ত্র ছিল। তাহা লোপ হইয়াছে।

২১। বেদাঙ্গীয় জ্যোতিষ কেবল বৈদিকযাগ যজ্ঞের কাল ও গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি প্রভৃতি নিরূপনার্থে রচিত হইয়াছিল। ফলে সেই মূল ভূমির উপরি দণ্ডায়মান হইয়া কালেতে আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, এবং ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা এই শাস্ত্রের উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।‡

---

* সম্প্রতি ঢাকানিবাসী কোন পণ্ডিত কাশী হইতে দ্বারভাঙ্গায় আগমন করিয়া কহেন যে, "আমি চারিবেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ পড়িয়াছি এবং মাহেশ ব্যাকরণের ২ অধ্যায় অধ্যয়ন করিয়াছি"। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, মাহেশের আর সকল অধ্যায় লোপ হইয়াছে।

† "ক" চিহ্নিত অতিরিক্ত পত্র দেখহ।

‡ "খ" চিহ্নিত অতিরিক্ত পত্র দেখহ।

২২। কল্পসূত্র মূল ধর্ম্মশাস্ত্র। এই শাস্ত্র দ্বারা প্রাচীন বেদের প্রয়োজন একেবারে রহিত হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগই প্রধানতঃ কল্পসূত্রের মূল। শাখাভেদে ব্রাহ্মণ ভাগ সমস্ত বিস্তর অংশে বিভক্ত। নানা শাখান্তর্গত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণখণ্ড হইতে কর্ম্মানুষ্ঠান সংগ্রহ পূর্ব্বক ও যে সকল আচার-প্রতিপাদক বেদাংশ লোপ হইয়াছিল—অথবা যে সব কর্ম্ম কেবল প্রথামূলকই ছিল—তাহা স্মরণ করিয়া আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ কল্পসূত্র সকল রচনা করেন। এই সকল কল্পসূত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। শ্রৌত সূত্র। যজ্ঞ ও কর্ম্মসকল পুনরুদ্ভাবিত করত একটি সুশৃঙ্খলাযুক্ত সাধারণ ব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত আর্য্যকুলকে এক নিয়মে বদ্ধ করা এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ব্যবস্থাপিত কর্ম্মসকল শ্রুতিমূলক বলিয়া ইহাকে শ্রৌতসূত্র কহে এবং এতদ্ভুক্ত কর্ম্মসকলকে শ্রৌতকর্ম্ম কহে। যথা, দর্শপৌর্ণমাস, অশ্বমেধ ইত্যাদি। কিন্তু সূত্রকারগণের এই প্রকার ধর্ম্মপ্রচারের ফল ভারতে বহুকাল থাকিল না। কেন না, ব্যবহারকালে সকলেই আপন আপন বংশপরম্পরা-প্রচলিত আচারই অনুষ্ঠান করিত; তাহাতে যাগ যজ্ঞ প্রায় পরিত্যক্ত হইল।

২। গৃহ্যসূত্র। ব্রাহ্মণদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যে সকল গৃহ-কর্ম্ম প্রচলিত ছিল, অথচ শ্রুতিতে যাহার কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিম্বা থাকিলেও যাহা কালক্রমে লুপ্ত হওয়াতে পূর্ব্বপরম্পরা স্মরণদ্বারা সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, তাহাই প্রচলিত রাখা গৃহ্যসূত্রের উদ্দেশ্য এবং তাহাই শাখানুসারে লোকে আজও পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন।

গর্ভাধান অবধি শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত তাবৎ ক্রিয়া গৃহ্যসূত্রের অন্তর্গত। পূর্ব্ব আচার স্মরণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়া এগুলিকে স্মার্ত্তসূত্র ও তদুক্ত কর্ম্মকে স্মার্ত্তকর্ম্ম কহে। এখন ভবদেব ভট্ট প্রণীত যে সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা গোভিলকৃত গৃহ্যসূত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

৩। সময়াচারিক সূত্র। সন্ধ্যাবন্দনা, সামাজিক দান ও ব্যবহারতত্ত্ব, আশ্রমবিহিত আচার ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রণয়ন করাই এই সকল সূত্রের উদ্দেশ্য ছিল। এগুলিও স্মার্ত্তসূত্র এবং এতদুক্ত ক্রিয়া স্মার্ত্তকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। অপরঞ্চ, সময়াচারিক সূত্রকে ধর্ম্মসূত্রও কহে।

২৩। এই তিন প্রকার ব্যবস্থা শাস্ত্র কল্পসূত্র নামে বিখ্যাত আছে। কালক্রমে কল্পসূত্র সকল বেদের তুল্য আদর পাইয়াছিল। কিন্তু কখনই শ্রুতি নাম প্রাপ্ত হয় নাই। "বেদত্বং কল্পসূত্রাণাং নোবক্তব্যং মনাগপি" কল্পসূত্র কখনই বেদ বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। তথাপি এ সমস্ত স্বাধ্যায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ফলতঃ কল্পসূত্রসকল বেদের স্থলাভিষিক্ত হওয়াতেই বেদ স্বয়ং পদচ্যুত হইয়াছে। অতএব এই সত্যটি সকলের ধারণ করা উচিত যে, প্রাচীন শাস্ত্রকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে যে সকল শাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, অনেক সময়ে, তাহাই প্রাচীনের স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়াছে। কল্পসূত্র কর্ত্তৃকও বেদের সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। "বেদাদৃতেঽপি কুর্ব্বন্তি কল্পৈঃ কর্ম্মাণি যাজ্ঞিকাঃ। নতু কল্পৈর্বিনা কেচিন্মন্ত্রব্রাহ্মণমাত্রকাৎ।" (কুমারিল)। যাজ্ঞিকেরা বেদ বিনা কেবল কল্পদ্বারা কর্ম্ম করিতে পারেন, কিন্তু কল্পসূত্র ব্যতীত

মন্ত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কিছু হয় না। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই প্রত্যেক বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা-ভেদে বহু ঋষির প্রণীত বহুতর শ্রৌত, গৃহ্য ও সময়াচারিক সূত্রগ্রন্থ ছিল। সে সকল একে একে রচিত হইতে কত শত বর্ষ লাগিয়াছিল বলা যায় না। কিন্তু এইক্ষণে তাহার বহু অংশ লোপ হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত আপস্তম্ব, বৌধায়ন এবং সত্যাষাঢ়-হিরণ্যকেশী এই তিন গ্রন্থ সম্পূর্ণ আছে। মানব কল্পসূত্রের কিয়দংশ লোপ হইয়াছে। ভরদ্বাজ সূত্র, বাধুনসূত্র, বৈখানসসূত্র, লৌগাক্ষিসূত্র, মৈত্রসূত্র, কঠসূত্র, বরাহসূত্র প্রভৃতি কল্পশাস্ত্র লোপ হইয়াছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাত্যায়নসূত্র সম্পূর্ণ আছে। সামবেদীয় মশাক, লাট্টায়ন, দ্রাহ্যায়ন ও গোভিল কৃত কল্পসূত্র সকল সম্পূর্ণ আছে। ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন ও সাঙ্খ্যায়ন এই দুইখানি কল্পশাস্ত্র আছে। অথর্ব্ব বেদের কুশিক সূত্র আছে। এই সকল বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের ভাষ্য ও টীকাও বহুতর।

২৪। সময়াচারিক অর্থাৎ ধর্ম্মসূত্রগ্রন্থসমূহ স্মৃতি-সংহিতার মূল। স্মৃতি-সংহিতার সংখ্যা বিংশতি। যথা "মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽংগিরাঃ যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী পরাশরোব্যাসসংখলিখিতাদক্ষগোতমৌ। সাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।" কিন্তু গৃহ্যসূত্র ও সময়াচারিক সূত্রই প্রকৃত স্মৃতি এবং উপরিউক্ত ধর্ম্মসংহিতাগুলি স্মৃতিনিবন্ধ বলিয়া পরিচিত হয়। কেবল সময়াচারিক আচার সংগ্রহ ও প্রচার করাই ঐ সকল স্মৃতিনিবন্ধের উদ্দেশ্য। দর্শপৌর্ণমাসাদি শ্রৌতকর্ম্মের অথবা গৃহ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া তৎসমূহের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু কল্পসূত্র ও অন্যান্য

সূত্রগ্রন্থ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রের সমষ্টি, মন্বাদি-স্মৃতি-সংহিতা সকল সেরূপ নহে। তৎসমূহ অনুষ্টুপাদি শ্লোকে লিখিত বলিয়া সূত্রগ্রন্থ অপেক্ষা অধিক সুললিত ও সহজে কণ্ঠস্থ থাকে। অপরঞ্চ, সময়াচারিক সূত্র অপেক্ষা মন্বাদি-স্মৃতি-শাস্ত্রে শৌচ, আচার, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও অন্যান্য বহুমঙ্গলজনক সুনীতি আছে। বর্ত্তমান মনুসংহিতা, যাঁহার আদর এবং শাসন অসামান্য, মানব নামক কল্পসূত্রই তাহার মূল। অপরাপর স্মৃতিনিবন্ধ সকল আপস্তম্ব প্রভৃতি সময়াচারিক সূত্র হইতে সঙ্কলিত।*

২৫। কল্পসূত্র সমূহ হইতে উত্তমরূপে বৈদিক ইতিহাস ও বেদান্তের আবশ্যকতা অবগত হওয়া যাইতে পারে। উহা হিন্দু-সমাজকে বেদবিহিত আচারে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্তে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না দর্শন-সূত্র সকল প্রণীত হইয়াছিল, তত দিন ধরিয়া বৌদ্ধ ও অন্যান্য বেদ-বিরোধী দিগের প্রখরযুক্তি সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই।*

দর্শন সূত্র।

সাধারণ প্রকৃতি।

২৬। ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত, এই ষড়্দর্শনই প্রধান এবং সূত্র-প্রণালীতে লিখিত। এই

---

* এই সকল বিবরণ ভট্ট মোক্ষমূলর প্রণীত সংস্কৃত সাহিত্য ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে অধিকাংশতঃ সংগৃহীত হইল।

সমস্ত দর্শন-সূত্র, বেদাঙ্গসূত্র-সমূহের পশ্চাৎ প্রচারিত হয়। কিন্তু ইহা কখনই স্বীকার করা যুক্ত নহে যে, পূর্ব্বে কোন না কোন আকারে কোন কোন দর্শনের মূল ভাব সমূহ প্রচারিত ছিলনা। বেদান্ত দর্শনের অনেক সূত্রে বাদরায়ণের অর্থাৎ ব্যাসের দোহাই আছে যথা, "পুরুষার্থোতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ" (আত্মবিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বেদের এই মত ব্যাস কহিয়াছেন)। এমত অবস্থায় ইহা অনুমান করা অযুক্ত নহে যে বেদান্ত সম্বন্ধে ব্যাসের মত, যাহা পূর্ব্বে অন্য কোন আকারে ছিল, তাহাই পশ্চাৎ অন্য কর্ত্তৃক বেদান্ত সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। এবং সেই বেদান্ত দর্শন এখন লোকমধ্যে ব্যাসের প্রণীত বলিয়াই চলিতেছে। বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ যুক্তি অন্য কোন কোন দর্শনেও সংলগ্ন হইতে পারে।

২৭। দর্শনসূত্র সমূহ ধর্ম্মশাস্ত্র রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। কেবল কল্পসূত্র ও স্মৃতি-নিবন্ধ সমূহই ধর্ম্মশাস্ত্র শব্দের বাচ্য। বেদোক্ত কর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্তে কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি-মূলক দর্শপৌর্ণমাসাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের যথাবৎ ব্যবস্থা প্রচার করা শ্রৌতসূত্রের উদ্দেশ্য ছিল এবং প্রথামূলক কর্ম্ম ও ব্যবহার সকল যতদূর স্মরণ ছিল তাহা ততদূর যথাবৎ প্রচার করা গৃহ্য ও সময়াচারিক সূত্রের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্রে যেমন স্বাধীন যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই, দর্শনশাস্ত্র সকল সেরূপ প্রকৃতির নহে। বৌদ্ধদিগের বেদ-বিরুদ্ধ যুক্তিকে শ্রুতি-সম্মত ও শ্রুতির অবিরুদ্ধ অথচ স্বাধীন যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া বেদবিহিত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গ রক্ষা করাই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নিম্নে সেই দর্শনসমূহের সংক্ষেপ

বিবরণ দিতেছি। অবশেষে বেদান্ত-দর্শনের অপেক্ষাকৃত বিশেষ বিবরণ প্রদান করিব।

২৮। দর্শনশাস্ত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে "তত্ত্ব," "পদার্থ," ও "কারণ" এই তিনটি শব্দের তাৎপর্য্য জানা উচিত। ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের আরম্ভেই কতিপয় পদার্থ অথবা তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যথা ন্যায়শাস্ত্রে ষোড়শ পদার্থ, বৈশেষিকে সপ্তপদার্থ, সাঙ্খ্য মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, পাতঞ্জল দর্শনে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেন। বর্ত্তমান সময়ে "পদার্থ" শব্দের প্রচলিত অর্থ কেবল কতিপয় ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু মাত্র। যেমন জল, স্বর্ণ, পারদ, মৃত্তিকা ইত্যাদি। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের ব্যবহৃত পদার্থ সকলের সেরূপ অর্থ নহে। ক্ষেত্রতত্ত্ব বা ব্যাকরণ পাঠ করিতে হইলে প্রথমেই যেমন কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা কণ্ঠস্থ করিতে হয়, দর্শন-শাস্ত্রের অঙ্গীকৃত তত্ত্ব ও পদার্থও সেই প্রকার ধাতু বা সংজ্ঞা মাত্র।*

* নবদ্বীপনিবাসী ৺ জগদীশ তর্কালঙ্কারের শব্দখণ্ডে আছে,—"রূঢ়ঞ্চ লক্ষকংচৈব, যোগরূঢ়ঞ্চ যৌগিকং। তচ্চতুর্দ্ধা পরৈরূঢ়-যৌগিকং মন্যতে-ধিকং॥ রূঢ়ং সঙ্কেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্ত্যতে। নৈমিত্তিকী, পারিভাষিক্যৌপাধিক্যপি তদ্ভিদাঃ॥" যে পদসমুদয় শক্তি দ্বারা অর্থ উৎপন্ন করে তাহার নাম রূঢ়, যেমন গো, মণ্ডপ, ঘট, পট ইত্যাদি। যে পদ স্বকীয় প্রকৃতার্থ ত্যাগ করিয়া কেবল লক্ষ্যার্থের বোধ জন্মায় তাহার নাম লক্ষণা। যেমন গঙ্গায় গোপ বসতি করে, অর্থ গঙ্গাতীরে গোপ বাস করে। লক্ষণা অনেক প্রকার আছে। যে পদ যৌগিকী শক্তি ও রূঢ়ি শক্তি উভয়ের দ্বারাই একার্থের বোধ জন্মায় তাহার নাম যোগরূঢ়। যেমন পঙ্কজ, জলধর, ধনদ, ইত্যাদি। যে পদ প্রত্যেক অংশের শক্তি দ্বারা অর্থ জন্মায় তাহার নাম যৌগিক। যেমন পাচক, ধনবান্, ভূপতি ইত্যাদি। যে পদ যৌগিকী শক্তি ও রূঢ়ি শক্তি ইহার অন্যতর শক্তির দ্বারা অর্থবোধ জন্মায় তাহাকে "রূঢ়-যৌগিক" কহে। যেমন উদ্ভিদ্, অন্ন ইত্যাদি। সঙ্কেতের ন্যায় যে নামটি রূঢ় অর্থ প্রতিপাদন করে তাহারই নাম সংজ্ঞা। সেই সংজ্ঞা তিন প্রকার। নৈমিত্তিকী, পরিভাষিকী, ও ঔপাধিকী।

এইরূপ উপকরণসমূহের তাৎপর্য্য অবগত হইলেই দর্শনশাস্ত্রে প্রবেশাধিকার জন্মে।

২৯। দর্শনশাস্ত্র মতে কার্য্যমাত্রের কারণ আছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে একপ্রকার পারিভাষিক শব্দ দ্বারা এবং বেদান্ত দর্শনে অন্যপ্রকার পারিভাষিক শব্দ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কারণের নামকরণ করা হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত কারণ তিন প্রকার। সমবায়ী কারণ, অসমবায়ী কারণ, এবং নিমিত্ত কারণ। যথা। বস্ত্রের সমবায়ী কারণ সূত্র—ঘটের সমবায়ী কারণ মৃত্তিকা। "সমবায়িকারণত্বং দ্রব্যস্যৈব বিজ্ঞেয়ং" (ইতি ভাষা পরিচ্ছেদ)। সমবায়িকারণত্ব কেবল দ্রব্যবৃত্তি হয়, অর্থাৎ দ্রব্যই দ্রব্যান্তরের যখন কারণ হয় তখন সেই পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রব্যকে পরবর্ত্তী দ্রব্যের সমবায়ী কারণ বলা যায়। অসমবায়ী কারণের ভাব কিছু সূক্ষ্ম। "গুণকর্ম্মমাত্র-বৃত্তি জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বং" (ইতি ঐ)। অসমবায়ি-কারণত্ব গুণ-কর্ম্ম-মাত্র-বৃত্তি হয়, অর্থাৎ সমবায়ী কারণের সম্বন্ধবিশিষ্ট যে কারণ তাহাই অসমবায়ী কারণ; যেমন বস্ত্রের সুত্রসংযোগরূপ যে কর্ম্মটি তাহাই বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ। এই উভয় হইতে ভিন্ন যে তৃতীয় প্রকার কারণ তাহার নাম নিমিত্ত কারণ। যেমন, কুম্ভকার ও তাহার দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র ঘটের প্রতি নিমিত্ত কারণ। বেদান্ত দর্শনেও ঐরূপ নিমিত্তকারণের ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তিনি সমবায়ী কারণকে উপাদান কারণ বলেন।—যেমন মৃত্তিকাই ঘটের উপাদান কারণ। মৃত্তিকাই ঘটরূপে পরিণত হইতেছে এজন্য উপাদান কারণের আর এক প্রতিশব্দ পরিণামী কারণ। এতদ্ভিন্ন বৈদান্তিকগণ আর একটি সাংকেতিক কারণ স্বীকার

করেন। তাঁহারা কহেন যে কারণ অন্য উপাদানের সাহায্য না লইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে, অথচ আপনি কার্য্যরূপে পরিণত হয় না তাহার নাম বিবর্ত্ত-উপাদান কারণ। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে রজ্জুই ঐ মিথ্যা সর্পজ্ঞানের প্রতি বিবর্ত্ত উপাদান কারণ হয়; অর্থাৎ রজ্জু স্বয়ং সর্প হয় না, অথচ অপর উপাদানের সাহায্য ব্যতীত মিথ্যা সর্পের ভাণ উৎপন্ন করে।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন।

৩০। ন্যায় দর্শনের মূল সূত্র সকল মহর্ষি গোতম প্রণীত এবং বৈশেষিক দর্শনের মূল সূত্র সকল মহর্ষি কণাদের প্রকাশিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই উভয়ের মধ্যে এইক্ষণে কোন শাস্ত্রেরই মূল সূত্রের সম্যক্ অনুশীলন নাই। কেবল উভয় শাস্ত্র সম্মত সংগ্রহ ও টীকা সকল সাধারণতঃ ন্যায়-শাস্ত্র নামে অধীত হইয়া থাকে। পারমার্থিক মত বিষয়ে এই দুই শাস্ত্রে প্রভেদ নাই। তৎসম্বন্ধে এ উভয়েই সমভাবে যুক্তি-প্রধান শাস্ত্র। অপর অপর যে যে বিষয়ে এ দুইয়ের মতভেদ আছে তাহা অতি সামান্য। যথা—

৩১। মহর্ষি গোতম ন্যায়সূত্রে ষোড়শপদার্থ অঙ্গীকার করেন। যথা—

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থান। (১) প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ। (২) প্রমাণের যে বিষয় তাহার

নাম প্রমেয়—যথা আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ (আকাশাদি পঞ্চদ্রব্যের বিশেষ গুণ), বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্য-ভাব (মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম), ফল, দুঃখ ও অপবর্গ (মুক্তি) এই দ্বাদশ প্রকার। (৩) এক অধিকরণে বিরুদ্ধ ভাবের নাম সংশয়। যথা, পর্ব্বত "বহ্নিমন্ত" কিম্বা বহ্ন্যভাববন্ত এইরূপ অনিশ্চিত জ্ঞান। (৪) প্রবৃত্তির মূল যে ইচ্ছা তাহার নাম প্রয়োজন। (৫) প্রকৃত বিষয়কে দৃঢ় করিবার জন্য কোন স্থলের প্রতি যে দৃষ্টি করা যায় তাহার নাম দৃষ্টান্ত; যেমন, যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নি থাকে; যথা—"রন্ধন-শালা"। (৬) শাস্ত্রার্থের নির্ণয়ের নাম সিদ্ধান্ত। (৭) বিচারাঙ্গ-বাক্যের নাম অবয়ব। যেমন; "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" পর্ব্বতে অগ্নি আছে। এই বাক্য বিচারসাপেক্ষ, এজন্য উহা "অবয়ব" হইল। (৮) অনিশ্চিত অর্থে নির্ভর পূর্ব্বক তত্ত্ব নির্ণয়ের নাম "তর্ক"। (৯) সিদ্ধান্ত বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞানের নাম "নির্ণয়"। (১০) তত্ত্বনির্ণয়ার্থে সরল বিচারের নাম "বাদ"। (১১)। স্বমত স্থাপন উদ্দেশে যে অন্যায় তর্ক করা যায় তাহার নাম "জল্প"। (১২) স্বমত স্থাপন হউক বা না হউক কেবল পরমত খণ্ডনার্থ তর্ককে "বিতণ্ডা" কহে। (১৩) যাহা প্রকৃত হেতু নহে, কেবল হেতুর আভাস মাত্র, তাহার নাম "হেত্বাভাস"। যথা "হ্রদো-বহ্নিভাববান্"; হ্রদোত্থিত বাষ্পকে ধূমভ্রমে যদি মনে করা যায় যে ঐ ধূম অগ্নির হেতুবোধক অতএব হ্রদে অগ্নি আছে, তবে তাদৃশ স্থলে ঐ বাষ্প "হেত্বাভাস" হইল। (১৪) বক্তার কথার অর্থান্তর কল্পনার দ্বারা যে দোষাভিধান তাহার নাম "ছল"। (১৫) অনেক আশ্রয়ে বর্ত্তমান যে পদার্থ তাহার নাম "জাতি" (ইহাকে বৈশেষিক দর্শনে "সামান্য" কহে),

যেমন দ্রব্যত্ব সকল দ্রব্যের "জাতি" বা সামান্যত্ব; এবং গোত্ব সর্ব্বপ্রকার "গোর জাতি" কি না গোত্বরূপ তত্ত্ব বা পদার্থটি সর্ব্ব প্রকার গোতে সমান ভাবে আছে। (১৬) বিচারের মধ্যে যে স্থলটিতে পরাজয় হয় তাহার নাম "নিগ্রহ-স্থান"। এই ষোড়শ পদার্থ সমুদয়ই বিচারের উপকরণ মাত্র। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র যে কেবল তর্ক ও বিচারের এক প্রণালীমাত্র তাহার সন্দেহ নাই। বেদান্ত-বিচারে পরিভাষানুরোধে ঐ সকল তর্ক প্রণালীর জ্ঞান সামান্যতঃ প্রয়োজনীয়। ফলে বিবেচনা করিতে হইবেক যে উপরে আত্মা, শরীর, মুক্তি প্রভৃতি যে দ্বাদশ প্রকার "প্রমেয়" পদার্থের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাই ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণের বিষয়। ঐ দ্বাদশ প্রকার পদার্থ সম্বন্ধে ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল বেদান্ত-পাঠের বিশেষ উপযোগী; যদিও ভাবপক্ষে উপযোগী না হয়, কিন্তু অভাব-পক্ষেও হইবেক। সেই সমস্ত পারমার্থিক বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন একমতাবলম্বী। তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব। সম্প্রতি অপর অপর যে যে বিষয়ে ন্যায় হইতে বৈশেষিক দর্শনের মত অন্য প্রকার তাহা বলিতেছি।

৩২। বৈশেষিক মতে সামান্যতঃ পদার্থ সপ্তবিধ। "দ্রব্যং, গুণা, স্তথা কর্ম্ম, সামান্যং, সবিশেষকং। সমবায়, স্তথাহ-ভাবঃ, পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥" (১) যাহা গুণের আশ্রয় তাহাই "দ্রব্য" পদার্থ। যথা, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, এবং মন এই ৯ প্রকার। (২) "গুণ" পদার্থ ২৪ প্রকার। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম,

এবং শব্দ। (৩) "কর্ম্ম" পদার্থ পঞ্চ প্রকার। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন। (৪) অনেক আশ্রয়ে বর্ত্তমান যে জাতি তাহারই নাম "সামান্য"। "সামান্য" দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যে সমানতা দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্মে বর্ত্তমান তাহার নাম "পর-সামান্য"; আর পৃথিবীত্বাদি যে জাতি তাহার নাম "অপর-সামান্য"। (৫) "বিশেষ" নামক পদার্থটি অন্য কোন দর্শনে স্বীকৃত হয় নাই। এই "বিশেষ" পদার্থকে গ্রহণ করাতে এই শাস্ত্রের নাম "বৈশেষিক দর্শন" হইয়াছে। যেরূপ ঘট পটাদি তাবৎ অনিত্য বস্তুর অবয়বের ভেদে পরস্পর ভেদজ্ঞান হয়, তদ্রূপ অবয়ব-রহিত নিত্যবস্তুর ভেদজ্ঞানার্থে "বিশেষ" পদার্থের স্বীকার। "অন্ত্যোনিত্যদ্রব্যবৃত্তি র্বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" অন্ত্য* অথচ নিত্য-দ্রব্য-বৃত্তি যে পদার্থ তাহার নাম "বিশেষ"। এক পরমাণুর সহিত অন্য পরমাণুর যে ভিন্নতা আছে, তাহা চক্ষুর অগোচর হইলেও সত্য, এবং সে বিশেষতা চিরকালই থাকিবেক। তাহাই "বিশেষ" পদবাচ্য। এই কারণে পার্থিব পরমাণু ও জলীয় পরমাণুঘটিত দ্রব্য সকলের আস্বাদ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। এই "বিশেষতা" জীবাত্মা সমূহেও প্রয়োগ হয়। একটি জীবাত্মার সহিত অন্য জীবাত্মার যে ভিন্নতা আছে, তাহারও কারণ এই "বিশেষতা"। জীবাত্মাদিগের পরস্পরের মধ্যগত বিশেষতা অনন্তকালেও তিরোহিত হইবেক না। তাহারদের প্রত্যেকের ভাবভঙ্গীর স্বতন্ত্রতা এবং সমুদয় জীবাত্মার মধ্যে এই রূপ আশ্চর্য্য বিচিত্রতা চিরকালই থাকিবেক। (৬) "সমবায়" পদার্থ

---

* "অন্তনিত্য" শব্দে প্রলয়ের পরস্থায়ী।

সম্বন্ধবাচক। যথা "অবয়বের" সহিত "অবয়বীর," "গুণের" সহিত "গুণীর," "ক্রিয়ার" সহিত "কর্ম্মীর," "নিত্য দ্রব্যের" সহিত "বিশেষ" পদার্থের এবং "দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম" এই তিনের সহিত "জাতির" যে সম্বন্ধ তাহার নাম "সমবায়"। "ঘটাদীনাং কপালাদৌ, দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ। তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" (ভাষা পরিচ্ছেদ)। এই ছয়টি পদার্থের সাধারণ নাম ভাব পদার্থ। অতঃপর সপ্তমে অভাব পদার্থ। "অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গাহন্যোন্যাভাবভেদতঃ। প্রাগভাবস্তথা ধ্বংসোহপ্যত্যন্তাভাব এবচ। এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে॥" "অভাব" পদার্থ দ্বিবিধ "অন্যোন্যাভাব" ও "সংসর্গাভাব"। ঘট পট হইতে ভিন্ন, ঘট পট নহে, এই যে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা ইহারই নাম "অন্যোন্যাভাব" অর্থাৎ ভেদ। আর "সংসর্গাভাব" ত্রিবিধ। (১) প্রাগ্‌ভাব; যেমন মৃত্তিকাতে ঘট হইবে অর্থাৎ ভাবিঘট মৃত্তিকা-সাপেক্ষ। (২) ধ্বংস, যথা ঘট নষ্ট হইয়াছে। এবং (৩) অত্যন্ত-অভাব, যেমন গৃহে ঘট নাই। বৈশেষিক মতে এই সপ্ত পদার্থ। ন্যায় দর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শাব্দ, এই চারি প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন, কিন্তু এইমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভিন্ন আর প্রমাণ নাই। শব্দ ও উপমান অনুমানের মধ্যগত। "শব্দোপমানয়োর্নৈব পৃথক্‌প্রামান্যমিষ্যতে। অনুমানগতার্থত্বাৎ ইতি বৈশেষিকং মতং"।* বৈশেষিকেরা শব্দ ও উপমানকে পৃথক্ প্রমাণ বলিতে ইচ্ছা করেন না। যেহেতু অনুমানেতেই তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। প্রধান

* ভাষাপরিচ্ছেদ ১২১। 1821. Calcutta.

প্রধান যে সকল বিষয়ে ন্যায় হইতে বৈশেষিক শাস্ত্রের মতভিন্নতা আছে তাহা এই প্রদর্শিত হইল। এইক্ষণে যে সকল পারমার্থিক বিষয়ে উভয়ের ঐকমত্য, তাহা কহিতেছি। বেদান্তের মতের সহিত তাহা তুলনা করিয়া বেদান্ত পাঠ করিলে বৈদান্তিক মতের তাৎপর্য্য সুন্দর বুঝা যাইবেক।

৩৩। ন্যায় ও বৈশেষিক এই উভয় শাস্ত্র বেদকে উচিত মত মান্য করেন্। কিন্তু কল্পসূত্র, স্মৃতি ও পূর্ব্বমীমাংসা যে প্রকার বেদকে নিত্য বলেন ইহাঁরা সেরূপ বলেন না। এই শাস্ত্রদ্বয় অসাধারণ বিচার-শক্তি সহকারে স্বীয় স্বীয় প্রতিপাদ্য বিজ্ঞান-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাঁরা উভয়ে সমভাবে পরমাত্মা, জীবাত্মা, জগৎ, পরলোক ও সুখ-দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি এই সমস্ত স্বীকার করেন। পরমাত্মার অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিত্য-জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্নাদি কতিপয় গুণ আছে। তিনি জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ। উপাদান কারণ তিনি নহেন। এই উভয় শাস্ত্রে প্রকৃতিকে স্বীকার করেন না, তৎপরিবর্ত্তে কেবল পরমাণু স্বীকার করেন। পরমাণু ও জীবাত্মাসমূহ "অন্ত্য-নিত্য" অর্থাৎ প্রলয়ে তাহারা নষ্ট হইবে না।* সেই সমস্ত পরমাণু

---

* ন্যায় ও বৈশেষিক মতে পরমাণু ও জীবাত্মা কোন প্রকার প্রলয়ে নষ্ট হয় না। ফলে এ সকল সূক্ষ্ম সৃষ্টি যে নৈমিত্তিক প্রলয়ে ধ্বংস হয়না তাহা পুরাণাদির মত। (আমার সৃষ্টিগ্রন্থে অণ্ড প্রকরণে প্রলয়ের বিবরণ দেখ)। যদি সে তাৎপর্য্যে এই উভয় দর্শন পরমাণু ও জীবাত্মাকে নিত্য কহিতেন, তবে পুরাণাদি শাস্ত্রের সহিত তাঁহাদের বিপ্রতিপত্তি হইত না। কিন্তু তাহা নহে; পূজনীয় উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থে লিখিয়াছেন "জন্যানাধারঃকালো মহাপ্রলয়ঃ" মহাপ্রলয়ে জন্যপদার্থ সকল থাকে না। জন্যপদে উৎপত্তিবিশিষ্ট। কিন্তু পরমাণু ও জীব নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী, অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ রহিত। সুতরাং মহাপ্রলয়ে উহারা নষ্ট হইবে না। পাশ্চাত্য

ও জীবাত্মারা জগতের উপাদান কারণ। অর্থাৎ পরমাত্মা পরমাণুগুলির দ্বারা জড় পদার্থ ও জীবাত্মাগুলির দ্বারা মনুষ্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। যত বার প্রলয় হইবে প্রলয়ান্তে তত বার উহারদের দ্বারা পরমেশ্বর জগৎ রচনা করিবেন।* উহারা আপনা হইতে এই সর্ব্বসামঞ্জসীভূত জগৎরূপে পরিণত হইতে পারে না। অতএব নিয়ন্তা রূপে ঈশ্বরও নিত্য ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যেমন পরমাণুকে স্থূল বিষয়ের উপাদান করিলেন, তদ্রূপ তাহাকে জীবের উপাদান করেন নাই। কারণ অচেতন চেতনের উপাদান হইতে পারে না। অতএব জীবও নিত্য ছিল।† ঐ পরমাণু ও জীবাত্মাসমূহ এই জড়

নৈয়ায়িকেরা মহাপ্রলয়ই স্বীকার করেন না; যথা—প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি সিদ্ধান্তলক্ষণে লিখিয়াছেন, "মহাপ্রলয়ে মানাভাবাৎ" মহাপ্রলয়ের প্রমাণ নাই। সুতরাং মহাপ্রলয়ে পরমাণু ও জীব নষ্ট হয় এমত আশঙ্কা পর্য্যন্ত থাকিতেছে না।

* এইরূপ সৃষ্টি যদি পূর্ণপাদস্বরূপ পরমাত্মাকর্ত্তৃক রচিত জ্ঞান না করিয়া তাঁহার একপাদস্বরূপ ব্রহ্মা অথবা ঈশ্বর কৃত জ্ঞান করা যায় তবে পুরাণের, মনু ও বেদান্তের সহিত প্রায় ঐক্য হয়। তাহাতে কেবল সর্গভেদ মাত্র থাকে। আমার সৃষ্টিগ্রন্থ দেখহ। বিশেষতঃ তাহার ৮৮ ক্রম।

† রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দেখিলে জানিবে যে, তাহার সহিত ন্যায় শাস্ত্রের মত এ ক্ষেত্রে প্রায় এক। রামানুজ কহেন পরমেশ্বর নিত্যকাল হইতে চিদচিৎবিশিষ্ট ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে অব্যাকৃত জীব ও জড় বিশিষ্ট ছিলেন। প্রভেদ এই যে রামানুজ অব্যাকৃত জীব ও জড়ের সহিত পরমেশ্বরের বিশিষ্টতা স্বীকার করেন, কিন্তু ন্যায় দর্শন জীব পরমাণু ও পরমেশ্বরের নিত্য স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপ উপাদান ও নিমিত্ত কারণের যে ন্যায়-প্রতিপাদিত নিত্যতা, তাহা কেবল নৈমিত্তক সৃষ্টি উপলক্ষে। (আমার সৃষ্টিগ্রন্থে ৮৮ ক্রমের শেষ টিপ্পনী দেখ) নতুবা পূর্ণব্রহ্ম হইতে অব্যাকৃত অবস্থায় জীব ও পরমাণুর স্বাতন্ত্র্য অসম্ভব। কেন না পরমেশ্বর পূর্ণব্রহ্মরূপে সর্ব্বব্যাপী। জীব ও পরমাণু ঐ সর্ব্বব্যাপীর অংশব্যাপী মাত্র হইতে পারে। তদ্ভিন্ন কোথা থাকিবেক? সুতরাং ব্রহ্মই জীব ও পরমাণু বিশিষ্ট ছিলেন। পুরাণেরও এই মত। অতএব উপাধিজন্য বাহ্যতঃ মত প্রভেদ থাকুক, প্রকৃত প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রেরই ঐক্য। বেদান্ত সূত্রে ২ অঃ। ২ পাঃ ও। ২। ৩ অধিকরণে পরমাণুর ধ্রুব নিত্যতা খণ্ডন করিয়াছেন।

ও জীবের সমবায়ী কারণ হইল।* পরমেশ্বর তাহার নিমিত্ত কারণ।

৩৪। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক পণ্ডিতগণ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যকে দ্বৈতপক্ষে অর্থ করেন। ইহাঁদের দ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বেই বলিলাম। ইহাঁরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং স্বর্গ ও অপবর্গ সম্বন্ধে কহেন যে, আত্মা জাতিবাচক। "আত্মত্ব জাতি" জীবের ন্যায় ব্রহ্মেতেও আছে। অতএব শাস্ত্রে ও লোকে ব্রহ্মকে পরমাত্মা কহেন। তবে যে ব্রহ্মেতে সুখ দুঃখাদির উৎপত্তি না হয়, তাহার কারণ সুখ দুঃখাদির হেতু যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি তাহার অভাব।† জীবাত্মা প্রত্যেক শরীরে এক একটি আছে। শরীর বা শরীরের ধর্ম্ম জীবাত্মা নহে। শরীরের চৈতন্য ও জ্ঞান নাই। "শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।" শরীরের চৈতন্য নাই; কারণ তাহা হইলে মৃতশরীরে ব্যভিচার হয়। সুতরাং জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত শরীর কর্ত্তা নহে। "আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা" জীবাত্মাই শরীরের অধিষ্ঠাতা। "অহঙ্কারস্যাশ্রয়োঽয়ং" এই জীবাত্মাই অহং জ্ঞানের আশ্রয়। "রথগত্যেব সারথিঃ।" যেমন রথের গতির দ্বারা সারথির অনুমান হয়, সেইরূপ পরকীয় দেহের চেষ্টা দৃষ্টে তাহাতে

---

* গীতায় ৭ অঃ ৪।৫ শ্লোকে যে নিকৃষ্ট প্রকৃতির উল্লেখ আছে, তাহারই স্থানে ন্যায় "পরমাণু" স্বীকার করেন। গীতায় যে উৎকৃষ্ট প্রকৃতির উল্লেখ আছে তৎপদে ন্যায় জীব স্বীকার করেন। অতএব সকল শাস্ত্রেরই এক মত। বুঝিলে, ভেদজ্ঞান নষ্ট হয়। গীতার উৎকৃষ্ট প্রকৃতিই বেদান্তের নির্ম্মলা অবিদ্যা। ৯৭ ক্রম দেখহ।

† বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত ভাষাপরিচ্ছেদের কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কৃত ভাষার্থ। ন্যায়দর্শন Calcutta. 1821, P. 32.

যত্নবিশিষ্ট জীবাত্মা থাকা অনুমান হয়। "বিভুর্ব্বুদ্ধ্যাদিগুণ-বান্" প্রত্যেক শরীরব্যাপী পৃথক্ পৃথক্ আত্মাই পৃথক্ পৃথক্ বিভু ও কতিপয় গুণের আশ্রয়। "জীববৃত্তীত্বিমৌগুণৌ" ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুই গুণ জীবাত্মার, পরমাত্মার নহে। যতদিন এমত জ্ঞান না জন্মিবে যে, আমি শরীর হইতে ভিন্ন, এবং যত দিন রাগদ্বেষাদির নিবৃত্তি না হইবে, তত দিন যজ্ঞাদি কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে না। সুতরাং তাদৃশ কর্ম্ম-ভোগার্থে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরই জন্মজন্মান্তরের ফলদাতা। যখন শরীর হইতে* আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানা যাইবে, যখন চিত্ত হইতে কর্ম্মফল-কামনা বিদূরিত হইবে, তখন আর জন্ম হইবে না। তখন আর শরীর-ধারণ হইবে না। তখন সুখের উন্মত্ততা ও দুঃখের কষাঘাত তিরোহিত হইবে। এই অবস্থায় জীবাত্মা শরীরান্তে মুক্তিলাভ করিবে। ঐ মুক্তির নাম অপবর্গ।

৩৫। ভারতীয় দার্শনিক যুগের প্রখর-যুক্তি-প্রিয় লোকদিগকে বৌদ্ধমত ও সম্পূর্ণ নাস্তিকতার প্রতিকূলে আস্তিক্য-পথে আবদ্ধ রাখার পক্ষে এই দর্শনদ্বয় বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণকে ইহাঁদের তর্ক-তরবারির আঘাত বেদনার সহিত সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাঁরা বৈদিক-কর্ম্মী ও ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন নাই।

৩৬। যাহা হউক ন্যায়দর্শন যে এক প্রকাণ্ড শাস্ত্র এবং তাহারই জন্য যে মিথিলা ও বঙ্গের অধিকাংশ গৌরব তাহার সন্দেহ নাহি। †

---

* সাংখ্যে "প্রকৃতি হইতে"। † গ চিহ্নিত অতিরিক্ত পত্র দেখ।

সাংখ্য দর্শন।

৩৭। এই দর্শন মহর্ষি কপিলের* প্রণীত। ইহার মতে ঈশ্বর অসিদ্ধ। এই হেতু এখন অনেকে ইহাকে নাস্তিক দর্শন বলিয়া মনে করেন। ফলতঃ এ দর্শন নিরীশ্বর হইলেও নাস্তিক নামের যোগ্য নহে। তাহার কারণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

৩৮। ইহার মতে জগতের মূলীভুত উপাদান সকল পঞ্চবিংশতি সংখ্যায় বিভক্ত। এইরূপ সংখ্যা করাতে ইহার নাম সাংখ্য হইয়াছে। নিম্নে উক্ত সংখ্যার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সাংখ্যদর্শনানুসারে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ঐ সংখ্যারই মধ্যগত আছে। ঐ পঞ্চবিংশতি সংখ্যাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কহে।

৩৯। উক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে মূল প্রকৃতি ও পুরুষ মাত্র নিত্য। তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদয় অনিত্য। ঐ প্রকৃতি পরমেশ্বরের সৃষ্টি শক্তি নহেন। কোন বিজ্ঞানময় নিয়ন্তৃ-পুরুষের কামনা কর্ত্তৃক তিনি কার্য্যে পরিণত হয়েন না এবং উহার স্বয়ংও কোন জ্ঞান চৈতন্য নাহি। উনি ন্যায়দর্শনানুমোদিত পরমাণু নহেন; কিন্তু "সৌক্ষ্মাত্তদনুপলব্ধিঃ" (কঃ সূঃ ১।১০৯) সর্ব্বব্যাপী এবং অনির্ব্বচনীয়। ঐ প্রকৃতির বিকার হইতে ক্রমপূর্ব্বক ত্রয়োবিংশতি পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পুরুষ অর্থাৎ জীব তাঁহার বিকার নহেন। পুরুষও তাঁহার তুল্য

* কপিলঃ—কর্দ্দমপ্রজাপতেরৌরসাদ্দেবহূতিগর্ভজাতঃ। ইতি শ্রীভাগবতং। (শব্দঃ কঃ দ্রু।)

নিত্য, কিন্তু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র। ফলতঃ প্রকৃতির বিকার যেমন উক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব, পুরুষের তদ্রূপ কোন বিকার নাহি। পুরুষ নিজেও কাহারও বিকার নহেন এবং অপর কিছুও পুরুষের বিকারজ নহে।

৪০। প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত যে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব তাহার নাম; যথা—মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চস্থূলভূত। ইহারা প্রকৃতির বিকার হইতে যেরূপ ক্রম-পূর্ব্বক উৎপন্ন হুইয়াছে নিম্নস্থ কপিলসূত্রে তাহা জানা যাইবে।

"সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রক্বাতঃ প্রকৃতেহর্ম্মান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।" (কঃ সূ। ১।৬১)।

সত্ত্ব রজ তমোগুণের সাম্যাবস্থা* প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব জন্মে, মহৎ হইতে অহঙ্কার জন্মে। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল ভূত জন্মে। তদ্ভিন্ন পুরুষ† স্বতন্ত্র।

৪১। প্রকৃতির বিকার কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে সূত্রকার লেখেন। "তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ" (কঃ সূঃ ১। ৯৬) প্রকৃতির উপরি পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। কেবল লৌহ ও অয়স্কান্তমণিবৎ একটি সম্বন্ধ আছে মাত্র। অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি সন্নিধানে অধিষ্টিত থাকাতে, প্রকৃতিতে বিকার জন্মে। সেই বিকারের নাম মহৎ অর্থাৎ

---

* সঙ্কোচাবস্থা—আমার সৃষ্টির অব্যক্ত প্রকরণ দেখ।

† ভাগবতে প্রতিলোমবুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মা ৩।২৬।৩।

মন*। ইহা হইতে এইরূপ বুঝিতে হইবে পুরুষের পূর্ব্বে মন* থাকেনা। কেবল প্রকৃতির সম্বন্ধাধীন তাঁহাতে মন* উৎপন্ন হয়। যদ্রূপ লৌহ জড়পদার্থ হইয়াও অয়স্কান্ত মণিকে আকর্ষণ ও তাহার ধর্ম্মকে গ্রহণ করে তদ্বৎ।

৪২। ফলতঃ প্রকৃতির স্বভাব এমত নহে যে কেবল স্বয়ংই থাকিবেন। পুরুষের উপকারে আসাই তাঁহার স্বভাব। তাদৃশ উপকার করা বা লওয়া কোন রূপ জ্ঞান-সাধ্য নহে। তদ্‌গ্রহণে পুরুষের জ্ঞানযুক্ত কর্তৃত্ব নাহি। কেবল প্রকৃতির সন্নিকর্ষ বশতঃ পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিবিধ উপকার প্রাপ্ত হয়েন। অতএব এ সম্বন্ধে জ্ঞানপূর্ব্বক পুরুষ কর্ত্তাও নহেন, গ্রহীতাও নহেন।†

৪৩। পুরুষ যখন মহত্তত্ত্ব লাভ করেন তখন সেই মহত্তত্ত্বই পুরুষেতে কর্ত্তৃত্ব উৎপন্ন করে। কেবল মহতের বিকার বশতঃ সেই কর্ত্তৃত্বের উদয় হয়। সেই কর্ত্তৃত্বের নাম অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারের দ্বারা পুরুষ আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। অতএব মহতই অব্যবহিত কর্ত্তা। ফলতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে মূল প্রকৃতিই আদি কর্ত্তা, কিন্তু তিনি অজ্ঞান। "অবিবেকাদ্বা তৎসিদ্ধে কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ" (কঃ সুঃ ১। ১০৬) পুরুষ অর্থাৎ আত্মাকে কেবল অবিবেকতা বশতঃ কর্ত্তা ও ফলভোগী মনে করা

---

* এই "মন" শব্দে কেবল উচ্চ মহত্তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ইহা ইন্দ্রিয়াধীশ "মন" নহে। বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত সাংখ্যসূত্রের টীকা দেখ। ২ অঃ। ১৮সূঃ। আরো ৪৫ ক্রমের টিপ্পনী দেখ।

† "পুরুষ কেবল সাক্ষীমাত্র, তিনি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, স্বয়ং সুখস্বরূপ। তাঁহার ঐ প্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমান হইলেই সংসার অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ এবং কর্ম্মদ্বারা বন্ধন ও বন্ধনকৃত পারতন্ত্র্য উপস্থিত হয়। (ভাঃ বঃ ৩। ২৬। ৭)

হয়। অতএব আত্মা সুখ দুঃখের ফলভোগী নহেন। কেন না তাদৃশ ফলভোগ বা কর্ত্তৃত্ব মন ও অহঙ্কার কর্ত্তৃক আত্মাতে সম্পাদিত হয়। আত্মা যখন জানেন যে আমি প্রকৃতি নহি কিন্তু স্বতন্ত্র ও পুরুষ, তখনি প্রকৃতি-জনিত মন ও অহঙ্কার তিরো-হিত হইলে আত্মা কৈবল্য অনুভব করেন। সেই কৈবল্যের বিবরণ পশ্চাৎ দিব। সম্প্রতি পঞ্চতন্মাত্রের ও অপরাপর তত্ত্বের উৎপত্তি-বিবরণ লিখিতেছি।

৪৪। প্রাগুক্ত অহঙ্কার ত্রিবিধ। তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক। "একাদশপঞ্চতন্মাত্রং যৎকার্য্যং।" (কঃ সূ ২।১৭।) একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র তাহা হইতে উৎপন্ন। "সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।" (কঃ সূ ২।১৮।) একাদশক যে মন তাহা সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য। এবং দশ ইন্দ্রিয় রাজসিক অহঙ্কার হইতে এবং তাহাদের বিষয় যে পঞ্চতন্মাত্র নামক সূক্ষ্ম পঞ্চভূত তাহা তামসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। অতএব এই একাদশ ইন্দ্রিয় সাংখ্যমতে ভূতোৎপন্ন নহে; কিন্তু আহঙ্কারিক। "আহ-ঙ্কারিকত্বশ্রুতের্নভৌতিকানি।" (কঃ সূ ২।২০।) ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক নহে, কিন্তু আহঙ্কারিক, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। ন্যায় ও বেদান্ত মতে ইন্দ্রিয়গণ ভূতজ।* ইন্দ্রিয়গণকে ভূতজ বলার প্রতি পূজ্যপাদ কপিলদেব এইরূপ কারণ প্রদর্শন করেন যে, "নিমিত্তব্যপদেশাৎ তদ্ব্যপদেশঃ" যেমন তেজ, কাষ্ঠের অব-লম্বনে, অগ্নিরূপে প্রকাশ পায়, এবং তদ্ব্যপদেশে অগ্নিকে কাষ্ঠোৎপন্ন বলা যায়, সেইরূপ অহঙ্কার ভূতগণের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণকে উৎপন্ন করে এবং সেই জন্য ইন্দ্রিয়গণকে

* আমার "সৃষ্টি" গ্রন্থের সূক্ষ্ম সৃষ্ট্যধ্যায় দৃষ্টি করহ।

ভূতোৎপন্ন বলা যায়।* (কঃ সূঃ ৫।১১০।) ইন্দ্রিয়স্থানের সহিত ইন্দ্রিয়কে এক জ্ঞান করা ভ্রম। "অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে।" ইন্দ্রিয়সকল অতীন্দ্রিয়, লোকে ভ্রান্তি-বশতঃ তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিষ্ঠা-স্থানের সহিত এক মনে করে। যথা, লোকে দৃশ্য চক্ষুকে চক্ষু-ইন্দ্রিয় ভাবে, কিন্তু তাহা নহে। ইন্দ্রিয়শক্তি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য। তাহা কেবল দৃশ্য-চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত আছে। (কঃ সূঃ ২।২৩।) আত্মা এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা। এবং ইন্দ্রিয়গণ আত্মার করণ। "দ্রষ্টৃত্বা-দিরাত্মনঃ করণত্বমিন্দ্রিয়াণাং।" (কঃ সূঃ। ২।২৯।) দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি কর্ত্তৃত্ব আত্মার ; করণত্ব ইন্দ্রিয়গণের। ফলে যদিও আত্মা নিষ্ক্রিয়, তথাপি ইন্দ্রিয়গণের সান্নিধ্য বশতঃ কর্ত্তা হয়েন,কারণ তিনিই ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে প্রেরণ করেন—যদ্রূপ অয়স্কান্তমণি লৌহকে স্পন্দিত করিয়া থাকে।

৪৫। ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য করণ কহে এবং মন ও তাহার অতিরিক্ত বুদ্ধি ও অহংকারকে অন্তঃকরণ কহে। ঐ অন্তঃকরণ কার্য্য ও অবস্থাভেদে ত্রিবিধ। "ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্" অন্তঃকরণ ত্রিবিধ। বুদ্ধি, অহংকার, মন†। বুদ্ধির স্বভাব নিশ্চয় করা।

---

* যদিও সাঙ্খ্য ইন্দ্রিয়গণকে ভূতজ বলেন না কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরকে ভুত-সংসর্গবিশিষ্ট বলিয়াছেন, ইহার পর তাহার দৃষ্টি করহ।

অপিচ আমার সৃষ্টিগ্রন্থে সূক্ষ্ম শরীর প্রকরণ দৃষ্টি করহ।

† বেদান্ত ও পুরাণে এই মনোবুদ্ধি অহঙ্কার জীবের। সাংখ্যেও উহা জীবের। তদ্ব্যতীত ৪১ ও ৪৩ ক্রমে যে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছি তাহাও যেন জীবেরই বোধ হয়। কিন্তু তাহা নহে। তাহা সৃষ্টি-নিয়ামক উচ্চ মহত্তত্ত্ব ও উচ্চ অহঙ্কার। পুরাণে তাহা ঈশ্বরের। সাংখ্যে তাহা বীজপুরুষের প্রাথমিক কর্ত্তৃত্ব। যাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্রাদি করিয়া জগৎ প্রকাশ পাইয়াছে। সাংখ্যের সেই উচ্চ-কর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন বীজ পুরুষ হিরণ্যগর্ভ শব্দের বাচ্য—সুতরাং ঈশ্বর। কেবল উপাধি ও বিশেষণের ভেদ ভিন্ন বিরোধ দেখিতে পাই না। আমার সৃষ্টিগ্রন্থে "মহত্তত্ত্ব" দেখ।

অহংকার শব্দে অভিমান। মনের কার্য্য সঙ্কল্প বিকল্প। (কঃ সূঃ ২।৩০)

৪৬। ইন্দ্রিয়গণ নিত্য নহে। এমত কি ইন্দ্রিয়াধীশ যে মন তাহা পর্য্যন্ত অনিত্য। কেবল প্রকৃতি এবং আত্মাই নিত্য। "প্রকৃতিপুরুষযোরণ্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্।" (কঃ সূঃ ৫।৭২) প্রকৃতি ও পুরুষ (আত্মা) ব্যতীত তাবৎ পদার্থ অনিত্য। নানা ইন্দ্রিয়ের সংসর্গাধীন মনের নানা অংশ আছে। কিন্তু মন পরমাণু-সমষ্টি নহে।

৪৭। এই শাস্ত্রে পঞ্চ প্রাণবায়ু সম্বন্ধে এই মাত্র উক্ত হইয়াছে যে "সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাবায়বঃ পঞ্চ"। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, কেবল মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অন্তঃকরণ-বৃত্তিত্রয়ের সামান্য অর্থাৎ সংযোজিত বৃত্তিমাত্র। উহারা বায়ুর ন্যায় গতিশীল বলিয়া উহাদিগকে বায়ু কহা যায়।* (কঃ সূঃ ২।৩১।)

৪৮। রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন, এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপত্তি হওয়ার বিবরণ করা গেল। এইক্ষণ ইহাই জানিতে হইবে যে পঞ্চতন্মাত্রণ† হইতে আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। "অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ"। অবিশেষ যে পঞ্চতন্মাত্র তাহা হইতে

---

* যদিও কপিলসূত্রে প্রাণকে অন্তরিন্দ্রিয়ভুক্ত করিয়াছেন কিন্তু কোন কোন সাঙ্খ্যাচার্য্য পঞ্চপ্রাণের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন এবং তদতিরিক্ত আরো পঞ্চবিধ প্রাণবায়ু আছে বলেন। যথা নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, এবং ধনঞ্জয়। কিন্তু বৈদান্তিক আচার্য্যেরা প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর মধ্যেই ও সকল গণ্য করেন। (বেদান্তসার ১৯।২০ পৃ)

† "স্থূলাৎপঞ্চতন্মাত্রস্য" কঃ সূঃ ১।৬২। পঞ্চস্থূল ভূত যখন আছে তখন তাহা হইতেই পঞ্চতন্মাত্রের অনুমান হয়।

বিশেষ বিশেষ স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এখন পূর্ব্বোক্ত মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, এবং পঞ্চ-স্থূল ভূত এই সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের বিবরণ সমাপ্ত হইল। এই সমস্তই প্রকৃতির বিকার-পরম্পরা হইতে আত্মার উপকারার্থে উৎপন্ন। কিন্তু আত্মা স্বতন্ত্র, প্রকৃতি স্বতন্ত্র। আত্মা জ্ঞানাধিকারী, প্রকৃতি অজ্ঞান অথচ পুরুষের যোগে জ্ঞানদায়িনী।

৪৯। "অচেতনত্বেহপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য" যদিও প্রকৃতি অজ্ঞান, তথাপি দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃ দধি হইতে পারে, প্রকৃতিও সেইরূপ, কাহারো চেষ্টাপরতন্ত্র না হইয়া পুরুষেতে মহদাদিরূপে পরিণত হন। (কঃ সূঃ ৩।৫৯) "স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ভৃত্যবৎ" ভৃত্য যেরূপ স্বভাবতঃ নিয়মিত অভ্যাসাধীন স্বামির সেবা করে, প্রকৃতি সেইরূপ স্বভাবতঃ কার্য্য করেন। (কঃ সূঃ। ৩।৬১)। "প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ" প্রকৃতিই মূল ও উপাদান কারণ, তাঁহা হইতে সমগ্র ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব উৎপত্তি হইয়া থাকে। (কঃ সূঃ ৬।৩২)। জীবের ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি এবং প্রত্যক্ষ আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল মৃত্তিকা সকলই তাঁহার বিকার। তিনিই মূল কারণ। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র কেবল গৌণ কারণ-পরম্পরা বিশেষ।

৫০। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতি-সম্ভূত। "আদ্যহেতুনাতদ্দ্বারাপারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ।" বৈশেষিক দর্শনে যেমন পারম্পর্য্যানুসারে পরমাণুকেই জগতের মূল উপাদান বলেন, সাঙ্খ্যেরাও তদ্রূপ মহদাদিকে মধ্যবিৎ মাত্র রাখিয়া পরম্পরাসম্বন্ধে প্রকৃতিকেই মূল কারণ কহেন। অতঃপর

সাঙ্খ্যদর্শন যদিও প্রকৃতিকে সূক্ষ্ম বলেন, তথাপি প্রকারান্তরে তাঁহার দ্রব্য-শক্তিতা অর্থাৎ বস্তুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কেন না তিনি কহেন যে, মূল উপাদান কারণ যে প্রকৃতি তাহাতে দ্রব্যত্বের অভাব হইলে তৎসম্ভূত এই প্রত্যক্ষ জগৎ অদ্রব্য সুতরাং মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু এই জগৎ কেবল দ্রব্যেরই সমষ্টি, সুতরাং সূক্ষ্ম বস্তু-শক্তি-বিশিষ্টা মূল-প্রকৃতি-সম্ভূত। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা নহে কিন্তু সত্য। "নাবস্তুনোবস্তুসিদ্ধিঃ" যাহা বস্তু নহে, তাহা হইতে বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। যখন বস্তুবৃত্তিসম্পন্ন জগৎ আছে তখন তাহার উপাদান প্রকৃতিও বস্তুগুণের আধার।* (কঃ সূঃ ১।৭৮)।

৫১। প্রকৃতি হইতে যেমন নানাবিধ জড়পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে সেইরূপ পঞ্চভূতের যোগে জীবের নিমিত্তে হস্ত পদাদি বিশিষ্ট স্থূল দেহসকলও উৎপন্ন হইয়াছে। স্থূল দেহ ব্যতীত প্রত্যেক পুরুষের এক এক সূক্ষ্ম দেহ আছে। "মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শইতরন্ন তথা।" স্থূল শরীর প্রায়ই মাতা পিতার যোগ-সম্পাদ্য, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ তদ্রূপ নহে। (কঃ সূঃ ৩।৭)। এই উভয় প্রকার শরীরের অব্যবহিত উপাদান প্রাগুক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব। প্রকৃতি তাহার আধার এবং পুরুষ তাহার আধেয় এবং ভোক্তা। পুরুষ স্থূল শরীরের দ্বারা ইহলোকে কর্ম্ম করেন। সেই স্থূল শরীরের সুখ দুঃখ বোধ নাই। সুখ দুঃখ কেবল সূক্ষ্ম দেহ

* সাঙ্খ্য ইন্দ্রিয়গণকে যদিও অভৌতিক বলিয়াছেন, তথাপি প্রকৃতি সূক্ষ্মরূপে দ্রব্যশক্তিযুক্ত হওয়াতে তৎসম্ভূত ইন্দ্রিয়াদি সকল পদার্থই দ্রব্য-ধাতুযুক্ত হইতেছে। সুতরাং তাহাতে পঞ্চতন্মাত্র নামক সূক্ষ্ম ভূতগণের সংস্পর্শ থাকা কিরূপে অস্বীকার করা যায়? এজন্য বেদান্ত দর্শন সঙ্গতরূপেই ইন্দ্রিয়গণকে ভূতজ বলিয়াছেন। আমার "সৃষ্টি" গ্রন্থে সূক্ষ্ম শরীরাধ্যায় দেখহ।

দ্বারাই উপলব্ধি হয়। “সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্” সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়বের একতা। (কঃ সূঃ ৩।৯)। যথা একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র নামক পঞ্চসূক্ষ্মভূত, এবং বুদ্ধি। অহঙ্কার বুদ্ধির অন্তর্গত।* এই সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহরূপ আধার ব্যতীত স্বয়ং থাকিতে পারে না। “নস্বাতন্ত্র্যাৎ তদৃতে ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ” যেমন আধার ব্যতীত প্রতিবিম্ব দাঁড়াইতে পারে না সেইরূপ স্থূল-শরীর ব্যতীত লিঙ্গশরীর থাকে না। সূক্ষ্ম শরীর অতি সূক্ষ্ম এজন্য কহিয়াছেন যে “অণুপরিমাণং তৎকৃতি শ্রুতেঃ” বেদে লেখেন যে তাহার আকৃতি অণুবৎ সূক্ষ্ম। (কঃ সূঃ ৩।১২)। এতাবতা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সূক্ষ্ম দেহ অতি সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহের অবলম্বনে থাকে। অতএব আত্মা যখন স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে যান এবং সূক্ষ্মদেহ তাঁহার অনুগামী হয়, তখন ঐ সূক্ষ্ম দেহ স্বীয় অবলম্বনের নিমিত্তে অন্য এক ব্যবহারিক স্থূল দেহ ধারণ করে এবং ভূতসংসর্গবিহীন হইয়া কদাপি লোকান্তরে যায় না।

৫২। সূক্ষ্মদেহ যে লোকেই গমন করুক তদীয় ইন্দ্রিয় সকলের উপাদান সর্ব্বত্রে একই প্রকার থাকে। “নদেশভেদেপ্যন্যোপাদানতাস্মদাদিবন্নিয়মঃ।” ৫।১০৯। দেশভেদে অর্থাৎ লোক লোকান্তর ভেদে সূক্ষ্ম দেহের উপাদান পরিবর্ত্তিত

---

* বেদান্ত দর্শনেও সূক্ষ্ম দেহ সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টি। প্রভেদ এই যে তাহাতে পঞ্চতন্মাত্র নাই এবং সাঙ্খ্যে পঞ্চ প্রাণ নাই। এই প্রভেদের সমাধান এই যে, সাঙ্খ্যমতে প্রাণপঞ্চ অন্তরিন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি মাত্র সুতরাং তাহার অন্তর্গত। তৎপরিবর্ত্তে পঞ্চতন্মাত্র গ্রহণের কারণ এই যে, সাঙ্খ্য ইন্দ্রিয়গণকে অভৌতিক বলেন। কিন্তু অভৌতিক হইলে তাহারা সূক্ষ্মশরীরে পরিণত হইয়া পরলোকে যাইতে পারে না। এইজন্য পঞ্চতন্মাত্র নামক সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে এস্থলে সূক্ষ্ম শরীরের অন্যতম উপাদান বলা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তে কোন প্রভেদ নাই।

হয় না। সূক্ষ্ম শরীর যেমন লোকান্তরে গমন করিতে পারে, সেইরূপ নানা জীবদেহে ও জড়পদার্থে প্রবেশ করিতে পারে, এবং পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিতে ক্ষমবান্। সূক্ষ্মদেহের এইরূপ গমনাগমন কেবল আত্মার নিমিত্তে, তাহার নিজের কোন স্বার্থ নাহি। "পুরুষার্থং সংসৃতি র্লিঙ্গানাং সূপকারবদ্রাজ্ঞঃ।" ৩।১৬। যেমত সূপকার রাজার নিমিত্তে পাক করে, নিজের নিমিত্তে নহে, সেইরূপ লিঙ্গশরীরের কার্য্য আত্মার জন্য।

৫৩। "লিঙ্গশরীর নিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য্যঃ"। ৬। ৬৯। সাঙ্খ্যদর্শন সনন্দনাচার্য্যের মতে একমত হইয়া কহিয়াছেন যে প্রকৃতি ও আত্মার মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা কেবল সূক্ষ্ম শরীরে প্রয়োগ হয়। ঐ সূক্ষ্ম শরীর ভৌতিক উপাদান স্বরূপে প্রলয় হইতে প্রলয়ান্তর পর্য্যন্ত আত্মাকে আশ্রয় করে। অর্থাৎ প্রলয়ে ঐ শরীর নষ্ট হয় না। কেবল জ্ঞান দ্বারাই পুরুষ উহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

৫৪। সৃষ্টির আদিতে বীজপুরুষের নিমিত্তে কেবল একমাত্র সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন ব্যক্তিভেদে তাহার যত সঙ্খ্যা দৃষ্ট হয়, ও পরে যত হইবে, ঐ আদিম বীজপুরুষের লিঙ্গদেহে তৎসমুদয়ের অব্যাকৃত সমষ্টি ছিল। "ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ" পশ্চাৎ কর্ম্মানুসারে * ব্যক্তিভেদ হইয়াছে। আদিতে ঐ সূক্ষ্মদেহ যে আদিম বীজ আত্মার অর্থাৎ মূল পুরুষের আধার-স্থান ছিল তাঁহারই নাম ব্রহ্মা অথবা হিরণ্য-গর্ভ। পশ্চাৎ এক পিতাতে যেমন অনেক সন্তানের বীজ

* বেদান্তসূত্রে ২।১।৩৫। "নকর্ম্মাবিভাগাদিতিচেন্নানাদিত্বাৎ" অর্থাৎ সৃষ্টি আর কর্ম্মের পরস্পর কার্য্যকারণস্বরূপে আদি নাই।

থাকে এবং সেই বীজ ক্রমে সন্তান[illegible]গর্ভযোগে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ ঐ হিরণ্যগর্ভ হইতে নানা সূক্ষ্ম-দেহাবচ্ছিন্ন নানা পুরুষ উৎপন্ন হইয়া পুরুষ-পরম্পরা ধরণীকে পূর্ণ করিয়াছে।

৫৫। সেই আদি পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বেদান্তাদি সেশ্বর শাস্ত্রে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু সাংখ্যমতে তিনি সমুদয় পুরুষত্বের সমষ্টি-স্থান স্বরূপ এক আদি মনুষ্য মাত্র হইতেছেন। কেন না সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে সৃষ্টির নিমিত্তে প্রকৃতিই একমাত্র কারণ, এবং পুরুষ ভোক্তা। যদি কেহ বলেন যে পুরুষের প্রতি সদসৎ-কর্ম্মের ফল কে বিধান করেন? তাহার উত্তরে সাংখ্য কহেন যে "নেশ্বারাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ"। (৫।২) ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করিলেই যে ফল নিষ্পত্তি হয় এমত নহে, ঈশ্বর থাকিলেও কর্ম্মই ফল দেয়। অতএব ঈশ্বর থাকায় সৃষ্টি সম্বন্ধে বা ফল সম্বন্ধে কোন উপকার নাই; বরং অপ-কার আছে। কেন না কোন সর্ব্বক্ষমতাপন্ন কর্ত্তা ও ফলদাতা থাকিলে, সাধারণের বিশেষ উপকার হয় না, যেহেতু তাহা থাকিলে "স্বোপকারাদধিষ্টানং লোকবৎ"। (৫।৩) লৌকিক রাজার ন্যায় সমস্ত রাজ্যই কেবল তাঁহারই স্বার্থ পূরণ করিবে। তথাপি যদি কেহ বলেন যে ঐ হিরণ্যগর্ভই ঈশ্বর, তাহাতে সাঙ্খ্য এইমাত্র উত্তর দিয়াছেন যে "পারিভাষিকো বা"। (৫।৫) সে কেবল পারিভাষিক বিবাদ মাত্র। অর্থাৎ ঈশ্বরবাদী ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ শব্দে যেমন ঈশ্বর বুঝেন সাঙ্খ্য তদ্দ্বারা সেইরূপ সমুদয় জীবের এক আদি বীজ-পুরুষকে বুঝেন এই মাত্র। তিনি কহেন "ইদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা"। ৩। ৫৭। এপ্রকার ঈশ্বর অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। কিন্তু

প্রকৃতির নির্ব্বা[illegible] নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর স্বীকার করা যাইতে পারে না। [illegible]মাত্র প্রভেদ। অতএব কেবল জ্ঞান-স্বরূপ নিত্য ঈশ্বর সম্বন্ধে সাঙ্খ্য শাস্ত্র "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (১।৯২।) ঈশ্বর থাকা সিদ্ধ হয় না বলিয়াছেন।

৫৬। যদিও সাঙ্খ্যদর্শন নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর না স্বীকার করুন, কিন্তু আত্মার নিত্যত্ব ও পরলোক, আত্মার বন্ধন ও মুক্তি, বেদের নিত্যতা ও যোগসাধন, এ সমস্তই স্বীকার করিয়াছেন।

৫৭। ইহার মতে আত্মা প্রত্যেক শরীরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। * তিনি নিত্য, নির্গুণ, চেতনস্বরূপ, সাক্ষী, কূটস্থ, দ্রষ্টা, ভোক্তা, বিবেকী এবং উদাসীন অর্থাৎ পুণ্য পাপে লিপ্ত নহেন। ইনি স্বয়ং নির্ম্মল ও নির্ব্বিকার, কেবল প্রকৃতির সংসর্গাধীন তাঁহাতে মহৎ, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, এবং অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। এই সকল হইতে আত্মা বহুজ্ঞান লাভ করেন। "জ্ঞানান্মুক্তিঃ"। ৩।২৩। প্রকৃতির সহযোগে আত্মা যে জ্ঞান লাভ করেন তাহাই তাঁহার মুক্তির কারণ হয়। যদিও আত্মা নিত্য-মুক্ত, কিন্তু "ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে।" (১।১৯)। স্বভাবের যোগব্যতীত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব বিশিষ্ট আত্মাতে বন্ধন জন্মে না। সেই বন্ধন প্রতিবিম্বিত মাত্র, নতুবা তাহা আত্মাতে চিরস্থায়ী নহে। কেবল মনেতে উহার সত্তা অনুভব হয়, "বাঙ্মাত্রং নতু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ"। ১।৫৮। অতএব বন্ধন কেবল কথা মাত্র, প্রকৃত নহে, উহা কেবল

* "নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধোজাতিপরত্বাৎ।" ১।১৫৪। আত্মাকে শ্রুতি যে কেবল একমাত্র কহিয়াছেন তাদৃশ কথন জাতিপর, সংখ্যাপর নহে। সুতরাং শ্রুতি-বিরোধ হইল না।

মনেতেই থাকে। "চিদবসানাভুক্তিস্তৎকর্মার্জ্জিতত্বাৎ"। ৬।৫৫। আত্মা যখন আপনাকে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র জানেন তখনই তাঁহার ভোক্তৃত্বের অবসান হয়। এইরূপ প্রকৃতির সহিত ভেদজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই পুরুষের মুক্তি হয়। যাগ যজ্ঞাদি করিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম অথবা স্বর্গাদি ভোগ হয়, কিন্তু মুক্তি হয় না। "তত্র প্রাপ্তবিবেক-স্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ"। ১। ৮৩। শ্রুতিতে আছে যে পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞান উপার্জ্জিত হইলে আর জন্ম হয় না।

৫৮। আত্মা অনেক সুতরাং সকলেরই ক্রমে ক্রমে মুক্তি হইতে পারে, কিন্তু সকলের মুক্তি হইয়া যদি সৃষ্টির অন্ত হয় এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন "ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ" (১।১৫৯।) ইদানীর ন্যায় সর্ব্বকালই সৃষ্টি থাকিবে, অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে না। কারণ পুরুষ অসংখ্য অসংখ্য। একেবারে সকলের মুক্তি অসম্ভব।

৫৯। আত্মাই কর্ত্তা, ভোক্তা এবং শরীরের অধিষ্ঠাতা। যদি আত্মা না থাকিত তবে শরীর গলিত স্খলিত হইত। "ভোক্তু-রধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ"। ৫।১১৪। এই শরীর কেবল আত্মা কর্ত্তৃক বিন্যস্ত হইয়াছে ও রহিয়াছে, নতুবা ইহা বিকৃত হইত। "ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্ব-মিন্দ্রিয়শক্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ"। (৫।১১৩) ইন্দ্রিয়শক্তিনিমিত্ত যে প্রাণত্ব, তাহাও আত্মার অভাবে দেহকে রক্ষা করিতে পারে না। "ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।" (৩।২০।) ভৌতিক শরীরের ধর্ম্মে চৈতন্য উৎপত্তি হয় না, ভূতপদার্থেও চৈতন্য জন্মায়না, কারণ তাহাদের প্রত্যেকে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না। অতএব বন্ধন হইতে যে মুক্তি হয় তাহার ভাগী চৈতন্য স্বরূপ

আত্মাই। মুক্তির আনন্দ শরীর, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ ভোগ করে না। কারণ তাহাদের স্বতন্ত্র চৈতন্য নাহি। প্রকৃতির সম্বন্ধাধীন তাহারা কেবল আত্মার উপকারার্থে আত্মাতে রঞ্জিত হইয়া থাকে এই মাত্র।

৬০। প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানে আত্মা হইতে ঐ রঞ্জন তিরোহিত হয়। সুতরাং আত্মাই মুক্তিলাভ করে। মুক্তিতে আত্মা কিরূপ সুখ অনুভব করে, তাহা দর্শাইবার নিমিত্তে কপিলদেব স্বীয় সাঙ্খ্যসূত্রের ৫ অধ্যায়ের ৭৪ অবধি ৮৩ সূত্র পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন যে, ভোগানন্দ, গুণবত্তা, ব্রহ্মলোকে বাস, স্মৃতিভ্রংশতা, আত্মনির্ব্বাণ, ঐশ্বর্য্য, লয়, অণুত্ব এবং অলৌকিকত্ব এসব কিছুই মুক্তি নহে। কেবল প্রকৃতির উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাইয়া আত্মাতে কৈবল্য অনুভবই মুক্তিশব্দের বাচ্য। সেই কৈবল্য "প্রকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র" এইরূপ যোগাভ্যাসে লাভ হইতে পারে। সেই যোগের নামই উপাসনা পূজা বা ধ্যান। "রাগোপহতির্ধ্যানম্।" ৩।৩০। ধ্যান দ্বারা বাসনা ক্ষান্ত হয়। বস্তুসান্নিধ্যজনিত বাসনাই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। ধ্যানই তাহা হইতে উদ্ধারের উপায়। "ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ" (৩। ৩২) ধারণা, আসন, কর্ত্তব্যসাধন, ইত্যাদি উপায়দ্বারা ধ্যান হইতে পারে। "আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরাবিবেকাৎ"। ৩। ৪৭। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ভপর্য্যন্ত তাবৎ সৃষ্টি কেবল আত্মার উপকারার্থে। অতএব কোন এক আত্মা যে পর্য্যন্ত আপনাকে প্রকৃতি-জনিত সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র না জানেন, সে পর্য্যন্ত সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হয় না। যে আত্মা ঐ মুক্তিজ্ঞান লাভ করেন তাঁহার সম্বন্ধে সৃষ্টির ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ

আর সৃষ্টি থাকে না। সাঙ্খ্যদর্শনোক্ত যোগসাধন এইরূপ। মহর্ষি পতঞ্জলি আপনার যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকার পূর্ব্বক এইরূপ যোগেরই বিস্তার করিয়াছেন। এইরূপ যোগ সচরাচর সাঙ্খ্য-যোগ বলিয়া উক্ত হয়।

৬১। সাংখ্যদর্শন যেমন আত্মার নিত্যতা, পরলোক, যোগসাধন এবং মুক্তি স্বীকার করেন তদ্রূপ আর্য্যকুলের শিরোরত্ন স্বরূপ বেদকেও মান্য করিয়াছেন। সাংখ্যসূত্রে আছে—"ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ।" ৫।৪৫। বেদ নিত্যকাল হইতে নাহি। উহা যে সৃষ্টবস্তু তদ্বিষয়ে শ্রুতি আছে। বেদান্ত সূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে তৃতীয় সূত্রে বেদের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়া কহিয়াছেন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" শাস্ত্রের অর্থাৎ বেদের কারণ ব্রহ্ম। সাঙ্খ্য আবার তাহাকে খণ্ডন করিয়া কহিয়াছেন "নপৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ" (৫।৪৬।) অর্থাৎ যাঁহারা বেদকে নিত্য বলেন তাঁহারা উহাকে অপৌরুষেয় বলেন। পুরুষ শব্দে এখানে পরমেশ্বর। অর্থাৎ পরমেশ্বরও যাহা সৃষ্টি করেন নাই কিন্তু নিত্যকাল আছে তাহা অপৌরুষেয়। বেদান্তসূত্রে বেদকে ব্রহ্মের সৃষ্টির অন্তর্গত করিয়া প্রকারান্তরে পৌরুষেয় কহিয়াছেন, যেহেতু ব্রহ্মই প্রকৃতির স্বামী পুরুষ। সাংখ্য কহিতেছেন "তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ"। বেদের তাদৃশ কর্ত্তা কোন বুদ্ধিমান্ ইষ্টসাধনতৎপর পুরুষ নাই। সুতরাং উহা পৌরুষেয় নহে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, যদি সাঙ্খ্য বেদকে নিত্যও কহিলেন না, ঈশ্বরের সৃষ্টও বলিলেন না তবে কি তিনি বেদকে মনুষ্যের কৃত বলেন? ইহার উত্তর এই যে স্পষ্ট তাহাও বলেন না। "যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে

তৎপৌরুষেয়ং।” ৫।৫০। যে কার্য্য করিতে বুদ্ধি প্রয়োজন হয়, সে কার্য্য অদৃশ্য হইলেও, তাহাকে পৌরুষেয় বা মনুষ্য-কৃত বলা যাইতে পারে। এস্থানে এই সিদ্ধান্ত উহ্য আছে যে বেদ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং অগত্যা সাংখ্যমতে বেদ “অপৌরুষেয়”। ফলতঃ সাংখ্যাচার্য্যদিগের মত এই যে মনুষ্য হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় সে সকল-কেই যে মনুষ্যের কৃত কহিতে হইবে এমত নহে। নিদ্রাবস্থায় যে নিশ্বাস নির্গত হয় তাহা কি মানুষের ইচ্ছাধীন বা বুদ্ধিকৃত কার্য্য? তাহাকে মনুষ্যের কৃত কার্য্য বলা যায়না। বেদও তদ্রূপ নিশ্বাসের ন্যায় নির্গত হইয়াছে। তাহা যদি কোন পুরুষ হইতে নির্গত হইয়াও থাকে তথাপি তাহাতে তাদৃশ পুরুষের বুদ্ধি, চিন্তা বা কর্ত্তৃত্ব কিছুমাত্র নাহি। এতাবতা প্রকারান্তরে সাংখ্যমতে বেদ অপৌরুষেয়ই হইতেছে। কপিলদেব এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন যে, বেদ যদি বুদ্ধি পূর্ব্বক কৃত না হইয়া থাকে তবে কি বেদ অসংলগ্ন, অসঙ্গত ও ভ্রমযুক্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার? তিনি এই পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত এইরূপ করিয়াছেন যে, “নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যং” ৫।৫১।* বেদ† নিজশক্তিতেই সত্যজ্ঞান প্রকাশ করেন এবং আপনিই আপনার প্রমাণ। অতঃপর বেদেতে যে দেবতা ও ফল বিষয়ে শ্রুতি আছে তৎসম্বন্ধে কপিল কহিয়াছেন যে

---

* বেদ ঋষিগণের হৃদয়ের ভাব হইতে উৎপন্ন। বুদ্ধিকৃত নহে। এই ভাবে অপৌরুষেয় এবং বেদান্ত এই তাৎপর্য্যেই উহাকে ঈশ্বর-প্রণীত বলেন। ৯ ও ১০ ক্রম দৃষ্টি করহ।

† এখানে বেদ শব্দে মানবের হৃদয়োৎপন্ন উপাসনা প্রবৃত্তি যাহা ব্যক্ত হইয়া অন্তে বেদ শাস্ত্র হইয়াছে। তাদৃশ হৃদয়োৎপন্ন উপাসনা বা মন্ত্র যে আপনিই আপনার প্রমাণ তাহা অনেকে এখনও স্বীকার করিয়া থাকেন।

"যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ" (৫।৪৪।) যে যদিও দেবগণ ও ফলশ্রুতি ইন্দ্রিয়ের অতীত, তথাপি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য কোন প্রকার বৈদিকজ্ঞান নিরর্থক নহে। তাহা হইতে আত্মাতে কোন না কোন প্রকার সুকৃতি উৎপন্ন হইবেই।

৬২। এতাবতা এই দর্শনের কর্ত্তা পূজ্যপাদ মহর্ষি কপিল যদিও স্পষ্ট বাক্যে নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ, নিরঞ্জন, পরব্রহ্ম স্বীকার না করুন এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে যদিও ঈশ্বর থাকা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করুন; তথাপি প্রকারান্তরে যখন সর্ব্বলোকপিতামহ হিরণ্যগর্ভকে স্বীকার করিয়াছেন, যখন জীবাত্মার নিত্যতা, পরলোক, মুক্তি, এবং মুক্তির জন্য যোগাভ্যাসের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন এবং যখন আর্য্যদিগের সকল ধর্ম্মের আকরস্বরূপ—সকল জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ—সকলের পূজনীয় বেদ শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধতা মান্য করিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহাকে কি বলিয়া নাস্তিক বলিব? সৃষ্টির সর্গভেদে*, পরমেশ্বরের উপাধি† বিষয়ে, তাঁহার মত অন্য শাস্ত্রের বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া, তিনি নাস্তিক, এমত কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। এ সম্বন্ধে আমি এ সংগ্রহে অধিক লিখিতে চাই না, কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে সাঙ্খ্য দর্শন এই ভারত-রাজ্যের সর্ব্বত্রে মান্য। যেমন বেদান্তের মত নানা শাস্ত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে, সেইরূপ সাংখ্যের মতও নানাশাস্ত্রে মিশ্রিত হইয়া আছে। কিন্তু প্রত্যেক শাস্ত্র সাংখ্যদর্শনের মতকে আপন আপন সাম্প্রদায়িক বসনে সু-

---

* আমার সৃষ্টি গ্রন্থে ৮৮ ক্রমের শেষ টিপ্পনী দেখ।

† এই গ্রন্থে ৪৫ ক্রমের টিপ্পনী দেখ।

সজ্জিত করিয়া লইয়াছেন।* ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে বিশেষরূপে সাংখ্যযোগ ও সাংখ্যদর্শনের মত প্রচার করা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের শ্রেণী অতি চমৎকার এবং উক্ত উভয় শাস্ত্রে তাহা আদরপূর্ব্বক পরিগৃহীত হইয়াছে।

"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং।
অত্র বঃ সংশয়ো মাভূজ্জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্॥"
(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যম্)

৬৩। ফলতঃ বৌদ্ধেরা বেদ, যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান অমান্য করায় যেমন হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, মহর্ষি কপিল যদি সেইরূপ বেদ ও কর্ম্মব্রহ্মণ† অমান্য করিতেন, তবে সহস্র পরলোক মানা সত্ত্বেও তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে নিশ্চয়ই হিন্দুসমাজের বহির্ভূত হইতে হইত। এই ভারতবর্ষে বেদের মান্য রাখিয়া যিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অনায়াসে সহ্য হইয়াছে, কিন্তু বেদকে পরিত্যাগ করিয়া

---

* যথা ভাগবতে ৩ স্কং ২৬ অঃ। পুরুষ অনাদি। প্রকৃতি অবিশেষ এবং বিষ্ণুর শক্তিরূপা। তিনিই ঐ পুরুষে উপগতা হন। মহত্তত্ত্বই উপাস্যরূপে বাসুদেব। অধ্যাত্মরূপে চিত্ত। এবং অধিষ্ঠাতৃরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ। সহস্রশীর্ষ পুরুষই অহঙ্কারোৎপন্ন ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনস্বরূপ। অহঙ্কারে দেবতারূপে কর্ত্তৃত্ব, ইন্দ্রিয়রূপে কারণত্ব, এবং ভূতরূপে কার্য্যত্ব আছে। মন অনিরুদ্ধ। তিনি শ্যামবর্ণ। ঐসকল মহত্তত্ত্ব এবং ইন্দ্রিয়াদি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অণ্ডরূপে পরিণত হয়। সেই অণ্ডে বিরাজ-পুরুষ জন্মেন। তাঁহা হইতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র উৎপন্ন হন। অপিচ রামমোহন রায়ের বেদান্তভাষ্য দেখ। ২। ২। ৪২—৪৫ সূ।

† সাংখ্য ব্রহ্ম স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতিকেই ব্রহ্ম বলেন। পুরাণমতে প্রকৃতি ব্রহ্মের একস্বরূপ, কিন্তু পুরুষই ব্রহ্মের প্রধান স্বরূপ। আমার সৃষ্টিগ্রন্থ অব্যক্ত প্রং দেখহ।

এখানে যে কোন মত বা কার্য্য প্রচার করা হইয়াছে তাহা ভারতের বেদ-সার-বিশিষ্ট অস্থিতে কখনই সহ্য হয় নাই।

৬৪। এই দর্শনের অনীশ্বরবাদ এবং প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব বেদান্তসূত্রে বিশেষরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। কেবল এক ঈশ্বর না মানা ব্যতীত সাংখ্যদর্শনের অনেক মতের, ন্যায় ও বেদান্তের সহিত ঐক্য হয়। ঐ ঐক্যরূপ মূলের উপরি দণ্ডায়মান হইয়া বেদান্ত ইহার সহিত বিচারে যতদূর পারগ হইয়াছিলেন এমত আর কোন দর্শন নহে। বেদান্তসূত্র ১।১।৫সূ। ১১সূ। "ঈক্ষতের্ন্নাশব্দং" স্বভাব জগৎকারণ নহে। স্বভাবের চেতনা নাই। কিন্তু "ঈক্ষতি" অর্থাৎ সৃষ্টির সংকল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা করে। সে চৈতন্য ব্রহ্মেতে আছে—প্রকৃতিতে নাই। "শ্রুতত্বাচ্চ" সর্ব্বজ্ঞের জগৎ-কারণত্ব সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে, অতএব জড়স্বরূপ স্বভাব জগৎ-কারণ নহে। "কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা" (১।১।১৮) জড়-প্রকৃতির কামনা সম্ভবেনা। বিনা কামনা স্বভাব কি মতে এই সর্ব্বসামঞ্জসীভূত জগৎ সৃষ্টি করিবেক।

পাতঞ্জল দর্শন।

৬৫। পাতঞ্জলসূত্র পতঞ্জলি মুনির প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদার্থ নির্ণয় বিষয়ে কপিলের ও ইহাঁর সমান মত। এই কারণে পাতঞ্জল দর্শনকে পণ্ডিতেরা সাংখ্যপ্রবচন কহেন। ইহার মতে জীবাতিরিক্ত পরমেশ্বর আছেন; সাঙ্খ্যের সহিত ইহার এই মাত্র প্রভেদ। এজন্য ইহার নাম সেশ্বর-সাঙ্খ্য এবং কপিলসূত্রের নাম নিরীশ্বর সাঙ্খ্য। এই

শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া যোগের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য ইহা যোগশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মত এই যে, প্রকৃতি হইতে জীব পৃথক্ এবং পরমেশ্বর উভয় হইতেই স্বতন্ত্র এবং সর্ব্বান্তর্যামী। মুক্তির দুই অঙ্গ, কার্য্য-বিমুক্তি ও চিত্ত-বিমুক্তি। যাহা জানিবার যোগ্য তাহা যত্ন পূর্ব্বক জানা এবং এমত বৈরাগ্য উপার্জ্জন করা যাহাতে সংসারের কোন ক্লেশে কষ্ট না দেয়, এই সকলের নাম কার্য্য-বিমুক্তি। আর বুদ্ধিকে জ্ঞানোপার্জ্জন পূর্ব্বক উন্নত ও চরিতার্থ করা, ঈশ্বরে সমাধি অর্থাৎ একচিত্ততা উপার্জ্জন করা ও আপনার স্বরূপে আপনি অবস্থিত হওয়া এই সকল চিত্ত-বিমুক্তি। এইরূপে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া আপনার বশে আপনি আগমন করা রূপ যে একটি কেবলতা তাহাই মুক্তি। তাহারই নাম কৈবল্য।

মীমাংসা দর্শন।

৬৬। এই দর্শন মহর্ষি জৈমিনির প্রণীত। বৈদিক ধর্ম্ম দ্বিবিধ। প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড, নিবৃত্তি-ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডই সংসার-ধর্ম্মে সর্ব্বদা প্রয়োজন। তাহাই ভারত-সমাজের বন্ধন। কল্পসূত্র ও স্মৃতি-নিবন্ধ সমূহ বৈদিক আচার ও ক্রিয়ার পদ্ধতি সকল উদ্ধার করিয়া কর্ম্মকাণ্ডকে জীবিত রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কর্ম্ম-কাণ্ডীয় শ্রুতি সকলের মধ্যে যে যে স্থলে অস্পষ্টতা ও পরস্পর বিরোধ ছিল অথবা তাদৃশ শ্রুতির সহিত যে যে স্থলে কল্প-শাস্ত্র ও মন্বাদি স্মৃতির বিপ্রতিপত্তি ছিল, ভারত-সমাজে

তাহার কোন মীমাংসা না থাকায় নানা অনর্থ উপস্থিত হইল। মহর্ষি জৈমিনি মীমংসা-দর্শনে তাহারই মীমাংসা করিয়াছেন। ইহার প্রথমেই আছে "অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসা" অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের অনন্তর ধর্ম্মজিজ্ঞাসা জন্মে। বেদাধ্যয়ন ব্যতীত শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধজ্ঞান ও শ্রুতি স্মৃতির বিপ্রতিপত্তিবোধ জন্মে না। বেদপাঠ দ্বারা তাদৃশ আশঙ্কা উপস্থিত হইলেই মীমাংসার প্রয়োজন হয়। তাহাকেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বলে। এই মীমাংসা-দর্শনে তাদৃশ জিজ্ঞাসুরই অধিকার। এই দর্শনানুসারে বেদ অপৌরুষেয় এবং বেদই ব্রহ্ম *। ঈশ্বর অথবা মানব কেহই তাহার কর্ত্তা নহেন। উহা নিত্য এবং আবহমান ক্রিয়া ও মীমাংসার একমাত্র প্রমাণ। যাঁহারা বেদকে ধারণ ও বৈদিক কর্ম্মাচরণ করেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। এই শাস্ত্র দ্বাদশাধ্যায়ে এবং সহস্র সংখ্যক অধিকরণে বিভক্ত। তাহার এক এক অধিকরণে এক এক প্রকার বিরোধের মীমাংসা আছে। ইতিপূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি যে, প্রত্যেক অধিকরণে পাঁচ পাঁচটি অঙ্গ থাকে। "বিষয়োঽবিষয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরঃ। নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতং।" যথা এক শ্রুতিতে আছে বৃক্ষসম্বন্ধীয় কুশদ্বারা যজ্ঞ করিবে, পর শ্রুতিতে আছে উডুম্বরবৃক্ষজাত কুশের দ্বারা উহা করিবে। এস্থানে কুশদ্বারা যজ্ঞকরার ব্যবস্থাটি "বিষয়"; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষের কুশ দিয়া যজ্ঞ হইবে কি উডুম্বর বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কুশের দ্বারা যজ্ঞ হইবে এইরূপ সন্দেহের নাম "অবিষয়"। "অবিষয়ঃ" অর্থাৎ "সংশয়ঃ"। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ

---

* বেদে অনেক স্থলে "ব্রহ্ম" শব্দে "মন্ত্রবর্ণ" অর্থাৎ বেদ।

তর্কোপন্যাসের নাম "পূর্ব্বপক্ষ"। সিদ্ধান্তানুকূল বিচারের নাম "উত্তরপক্ষ"। "নির্ণয়" শব্দে "সঙ্গতি" অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-সিদ্ধ বিচার্য্য বাক্যে তাৎপর্য্যাবধারণ। উপরি উক্ত "কুশা-হরণ" বিষয়ে সূত্রকার মীমাংসা করিয়াছেন যে "অপিতু বাক্য-শেষঃস্থাদন্যায্যত্বাৎ বিকল্পস্য বিধীনামেকদেশঃস্যাৎ" অর্থাৎ পরশ্রুতি পূর্ব্বশ্রুতির অঙ্গস্বরূপ, অতএব পরশ্রুতির তাৎপর্য্য পূর্ব্বশ্রুতিতে প্রয়োগ পূর্ব্বক মীমাংসা করিতে হইবেক। নতুবা বিকল্প-দোষ বর্ত্তে। এই সূত্র উপরি উক্ত কুশ বিষয়ে প্রয়োগ করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবেক যে, উডুম্বর সম্বন্ধীয় কুশ দ্বারা যজ্ঞ করাই উদ্দেশ্য; সামান্য বৃক্ষ উদ্দেশ্য নহে। এই দর্শনের সাধারণতঃ এই ভাব। ইহাতে নিবৃত্তি-ধর্ম্মের অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের কোন মীমাংসা বা উপদেশ নাই। এতদনুযায়ী ক্রিয়া-সাধনে যজমানকে বুদ্ধি, যুক্তি, অনুভব প্রভৃতি চালনা করিতে হয় না। এই বর্ত্তমান কালে যজ্ঞাদি ক্রিয়া নাই। কিন্তু ক্রিয়া যত আছে, বৈদিকই হউক আর তান্ত্রিকই হউক, তাহার কোনটির সাধনেই হৃদয় অথবা মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয় না। যথাব্যবস্থা কর্ম্ম করিলেই সমাজ রক্ষা হইতে পারে। তাহাতে যজমান ঈশ্বরকে মানুন বা না মানুন সামাজিক ক্ষতি নাই। এই প্রকারের লোক এখন প্রাচীন হিন্দুসমাজেও অনেক, অনীশ্বরবাদী যুবা কৃতবিদ্য-দিগের মধ্যেও অনেক। শেষোক্ত ব্যক্তিরা ব্রহ্ম অথবা কর্ম্ম জন্য সুকৃতি না মানিয়াও ঐরূপ অনেক ক্রিয়া করিয়া থাকেন। ঐ উভয় সম্প্রদায়ই কর্ম্মী শব্দের বাচ্য। কেবল সামাজি-কতা ও যশঃ তাঁহাদের কর্ম্মের জীবন—ভগবান্ নহেন, বিশ্বাস নহে, জ্ঞানও নহে। উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি

শাস্ত্রে ঐরূপ অনীশ্বর-কর্ম্মের নিন্দা করিয়া ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে, ইশ্বর-দৃষ্টিতে কর্ম্ম করিতে আদেশ দিয়াছেন। তাহাতেই ভারতে ক্রমে ক্রমে নীরস ক্রিয়ায় ব্রহ্মরস প্রবেশ করিয়াছে। জৈমিনিদেবের প্রকাশিত পূর্ব্ব মীমাংসার পশ্চাৎ ব্যাস দেব জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের বিচার করেন। তাঁহার সেই বিচার-গ্রন্থের নাম উত্তরমীমাংসা। তিনি তদ্দ্বারা সমস্ত বেদকে ও তদুক্ত সমস্ত কর্ম্মকে ব্রহ্মেতে সমন্বিত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য উহার ভাষ্যে মূর্খ ও জ্ঞানবিহীন কর্ম্মীদিগকে নিন্দাপূর্ব্বক হৃদয়গত-অনুভব-সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মোপাসনা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলেই সকল সময়ে ঈশ্বর-দৃষ্টি করিতে পারে না এজন্য তাদৃশ দুর্ব্বলাধিকারীদের পক্ষে বিশ্বাসবিহীন কর্ম্মও সুকৃতিজনক বলিয়া কথিত হয়।*

মূল বেদান্ত অথবা জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ।

সাধারণ বিবরণ।

৬৭। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক বেদ অর্থাৎ উপনিষৎ সমূহই মূল বেদান্ত শব্দের বাচ্য। ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং ঐতরেয় এই দশখানি উপনিষৎ মাত্র প্রধান ও প্রাচীন। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই দশখানি মাত্রকে বিশেষরূপে ব্রহ্ম-বিচার স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত

---

* ঘ চিহ্নিত অতিরিক্ত পত্র দেখ।

আরো অনেক উপনিষৎ আছে।* তন্মধ্যে শ্বেতাশ্বতর, বৃহন্নারায়ণীয়, তাপনীয় প্রভৃতি কএকখানি ভিন্ন অবশিষ্টগুলি বেদান্তবিজ্ঞানের প্রমাণ স্বরূপে গণ্য হয় না। উপনিষৎ শাস্ত্রই ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ ভাণ্ডার এবং ভারতীয় সমুদয় জ্ঞান-প্রধান শাস্ত্রের, সমুদয় ভক্তিপ্রধান শাস্ত্রের, সমুদয় প্রেমপ্রধান শাস্ত্রের, এবং সমুদয় অধ্যাত্ম ও যোগ শাস্ত্রের উৎস-স্বরূপ। মহাভারত, ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, শ্রীমদ্ভাগবত, অষ্টাদশ পুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ, এবং অসংখ্য অসংখ্য তন্ত্র শাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদের বচন এবং ভাব সেই সেই শাস্ত্রের জীবন-স্বরূপে প্রবেশ করিয়া আছে।

৬৮। উপনিষৎ-মীমাংসার জন্যই বেদান্ত সূত্র। অতএব বেদান্তসূত্রের বিবরণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উপনিষদের বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপনিষদ্ শাস্ত্রের মত দ্বিবিধ। এক অদ্বৈত, দ্বিতীয় দ্বৈত। অদ্বৈত মত এই যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। দ্বৈত মত এই যে, ব্রহ্মও আছেন, জীব ও জগতও আছে। কেবল আপাততঃ এই দুইটি মতকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বোধ হয়; কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝিলে ঐ স্বতন্ত্র-বোধ থাকে না। ইতিপূর্ব্বে নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ ও বিবর্ত্ত-উপাদান-কারণ এই তিন প্রকার কারণের বিবরণ করিয়াছি। এখন প্রশ্ন এই যে, ইহার মধ্যে জগৎ-সৃষ্টির প্রতি ব্রহ্ম কোন্ কারণ? বেদের ব্রাহ্মণযুগে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঋষিকুমারগণ আপন আপন আচার্য্য ও প্রধান

---

* সমুদয়ের সংখ্যা ১০৮। তন্মধ্যে ১০ খান ঋগ্বেদীয়, ১৯ খান শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়, ৩২ খান কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়, ১৬ খান সামবেদীয়, এবং ৩১ খান অথর্ব্ববেদীয়।

প্রধান ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিদিগকে সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করিতেন যে, হে আচার্য্য! জগৎ-সৃষ্টির প্রতি ব্রহ্ম কিরূপ কারণ তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন।

"ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃস্মজাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু। বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদোব্যবস্থাং। কালস্বভাবোনিয়তির্যদৃচ্ছা ভুতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা। সংযোগ এষাং নত্বাত্মভাবাদাত্মা-প্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥"

(শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ—১ম অধ্যায়ে)

ব্রহ্মবাদীরা বলেন, হে ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তিগণ! ব্রহ্ম কিরূপ কারণ? কোথা হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি? কাহার দ্বারা আমরা জীবিত আছি? কোথায় আমরা স্থিতি করি? কাহার নিয়মে আমরা সুখ দুঃখের অধীন হইয়াছি? কাল, স্বভাব, আকস্মিক ঘটনাসূত্র, পঞ্চভূত, প্রকৃতি, পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা ইহারদের কেহ কি জগৎ-কারণ? অথবা ইহারদের সকলের সংযোগেও তো সৃষ্টি হইতে পারে না। আর আত্মাও অতি দুর্ব্বল এবং সুখ দুঃখের অধীন সুতরাং তাহাই বা কি প্রকারে জগৎ-কারণ হইতে পারে। এই প্রকারের প্রশ্নসমূহের উত্তরে ঋষিরা কহিয়াছেন। "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং" পরমাত্মার সৃষ্টিশক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি যাহা স্বীয়গুণের দ্বারা নিগূঢ় তাহাই জগতের কারণ। পরমাত্মা তাহারই নিয়ন্তা। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ইক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি স ইমান্ লোকান্ সৃজত।" (ঐতরেয় উপনিষৎ) এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন। অন্য কিছু ছিলনা। তিনি সৃষ্টি কামনা করিয়া

আলোচনা করিলেন। আলোচনা করিয়া এই সমুদয় লোক সৃজন করিলেন।

৬৯। সেই পরমাত্মা হইতেই পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে*। এইপ্রকার অনেক শ্রুতি আছে যাহার দ্বারা জানা যায় যে ব্রহ্মই জগৎ-কারণ, তাঁহা হইতেই জীবাত্মা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকার শ্রুতিসমূহকে দ্বৈতপ্রতিপাদক বলা যাইতে পারে। কেন না এসকল শ্রুতির মতে ব্রহ্ম জগতৎকারণ—জগৎ ও জীবাত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা। জীবাত্মা সুখ দুঃখের অধীন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। ফলে ন্যায়শাস্ত্র ও বৈশেষিক দর্শন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে যেরূপ দ্বৈতভাব অঙ্গীকার করেন, এস্থলের দ্বৈতবাদ সে প্রকার নহে। ন্যায় ও বৈশেষিকের মত আপাততঃ এইরূপ বোধ হয় যে, নিত্যকাল হইতেই জীবাত্মা ও পরমাণু আছে, পরমেশ্বরও নিত্যকালই তাহা হইতে স্বতন্ত্র। অতএব উপনিষদে যে দ্বৈতবাদ আছে তাহাকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের দ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিয়া রাখা উচিত। প্রশ্ন-উপনিষদের চতুর্থ প্রশ্নে নবম শ্রুতিতে দ্বৈতভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে "এষহি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞনাত্মা পুরুষঃ। স পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে।" এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন, কিন্তু তদ্রূপ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহার নিজের একটি কর্ত্তৃত্ব আছে; যথা দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণন, আস্বাদন, মনন, বোধন ইত্যাদি সকল কর্ম্মেরই কর্ত্তা ঐ জীবাত্মা। সে

* আমার সৃষ্টিবিষয়ক গ্রন্থে সূক্ষ্মসৃষ্টি প্রকরণে জীবাত্মা সৃষ্টির বিবরণ দৃষ্টি করহ।

কর্ত্তৃত্ব-শক্তি বাহ্য করণ স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণেরও নহে, মনোবুদ্ধি আদি অন্তঃকরণেরও নহে এবং পরমাত্মারও নহে *।

৭০। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিসস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" "দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয়ে পরস্পর সখা; তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফলভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।" (ঋক্ ১মা১৬৪সূ।) এই রূপকটি ভাঙ্গিয়া বুঝ—জীবাত্মা যখন পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন তখন সর্ব্বাদাই তাঁহারা দুজনে একত্র আছেন। জীবাত্মা দেহেতে বদ্ধ, পরমাত্মাও সেইখানে তাহার সযুজা ও সখা স্বরূপে বর্ত্তমান। যদিও অদ্বৈতবাদীরা সমানাধিকরণ বশতঃ প্রেমদৃষ্টিতে ঐ যুগ্ম আত্মাকে এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা উভয়ে যে সংখ্যাতে এক নহেন তাহা ঐ শ্রুতির দ্বিতীয় চরণেই স্পষ্ট আছে। অর্থাৎ তন্মধ্যে জীবাত্মা স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করেন, পরমাত্মা কেবল তাহার সাক্ষীস্বরূপ।

৭১। এই প্রকারের স্পষ্ট দ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতি উপনিষদের মধ্যে বিস্তর আছে। বেদ-সংহিতার মধ্যেও দ্বৈতভাবে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে "যোনঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যো

---

* উচ্চ বেদান্ত-বিজ্ঞানানুসারে এই কর্ত্তৃত্ব ব্যবহারিক মাত্র এবং আগমাপায়-বিশিষ্ট। কেননা উহা জীবের বীজভাবেতে কূটস্থ চৈতন্যের আশ্রয়ে বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়। বিষয় বিনিবৃত্ত হইলেই আত্মা কৈবল্য অথবা ব্রহ্মাত্মভাব লাভ করে। ফলে তখন তাদৃশ কর্ত্তৃত্বের যে অত্যন্ত অভাব হয় বেদান্তের এমত তাৎপর্য্য নহে। তখন তাহা দমিত থাকে এই মাত্র। সমাধিভঙ্গে পুনরুদ্দীপিত হয়। এই গ্রন্থে শাঙ্কর ভাষ্য দৃষ্টি করহ।

দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা।” (ঋক্ ৮ অষ্ট। ৩অ। ১৭ব।) যিনি আমাদের পিতা, যিনি আমাদের জনক, যিনি আমাদের বিধাতা, যিনি সমুদয় স্থান ও সমুদয় ভুবন জানিতেছেন, যিনি দেবগণের পিতা, যিনি অদ্বিতীয়, তাঁহা হইতে “ভিন্ন” সমস্ত জগৎ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতেছে। “সনোবন্ধুর্জ্জনিতা সবিধাতা” তিনি আমাদের বন্ধু, পিতা এবং বিধাতা। “পিতানোসি পিতা নোবোধি।” তুমি আমারদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান দেও।* এই কএকটি স্থলে পরমাত্মা পিতা, জীবাত্মা পুত্র, জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন এই রূপ দ্বৈতভাব রহিয়াছে। এ সকল কথা লইয়া কোন তর্ক নাই। কিন্তু “কিংকারণংব্রহ্ম” ব্রহ্ম কিরূপ কারণ এইরূপ প্রশ্নের উত্তরেই বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ ও আড়ম্বরের সূত্রপাত দেখা যায়। উপনিষদের মত এই যে “সৃষ্টি হইবার অগ্রে জগৎ ব্রহ্মরূপ কারণেতে অব্যক্তরূপে বিদ্যমান ছিল”; ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন আর তাঁহার শক্তিরূপ উপাদান হইতে তাহা ব্যক্ত হইল। এইরূপ মতের, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অঙ্গীকৃত অনাদি-দ্বৈত-তত্ত্বের সহিত ঐক্য হয় না; কিন্তু এই মতই ব্যাসদেব-প্রণীত বেদান্তসূত্রে ধৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে ক্রমে তাহাই বিস্তীর্ণ-বেদান্ত-দর্শনে বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে।

৭২। উপনিষদের মতে ব্রহ্ম জগতের যেরূপ কারণ মুণ্ডক উপনিষদে তাহার আভাস আছে। “যথোর্ণনাভিঃ

---

* যজুঃসংহিতা—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

সৃজতে গৃহ্নতেচ যথা পৃথিব্যাং ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি যথা স্বতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং।" যেমন ঊর্ণনাভি স্বীয় অঙ্গ হইতে তন্তু সৃজন করে এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীর উপরে ওষধি সকল জন্মে, যেমন মনুষ্য দেহ হইতে আপনা হইতে কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি হইল; যদিও এই কথাই সহজ কিন্তু স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল "কিং কারণং ব্রহ্ম" তিনি কিরূপ কারণ? নিমিত্ত কারণ, না উপাদান কারণ, না আর কোন প্রকার কারণ? তিনি ইচ্ছা করিলেন আর সৃষ্টি হইল, সত্য। কিন্তু সৃষ্টিকে যেপ্রকার বিপুল পদার্থ ও জীব পরিপূর্ণ ব্যাপার দেখা যাইতেছে ইহা পূর্ব্ব হইতে না থাকিলে, অথবা কোন দ্রব্য-ধাতু-বিশিষ্ট উপাদান বিনা, কি কেবল এক নির্গুণ ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে? এ কথার সহজ ও স্থূল উত্তর এই যে, পূর্ব্ব হইতেই ঈশ্বরের সগুণ শক্তির মধ্যে অব্যক্ত ভাবে সৃষ্টি ছিল। ইচ্ছার আলোচনাতেই উহা ঐ শক্তি হইতে ব্যক্ত হইয়াছে। বেদান্তসূত্র ২।১।১৬। "সত্তচ্চাবরস্য" অবর অর্থাৎ জগৎরূপ কার্য্য সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে ছিল। কিন্তু তখন জগৎ নামরূপে প্রকাশ ছিল না। এখনও ব্রহ্মেরই মধ্যে আছে, কিন্তু নাম-রূপে প্রকাশ হইয়া আছে। অতএব কথিত হইয়াছে যে, যেমন ঊর্ণনাভি আপনার উদর হইতে তন্তু সৃজন করে ও ইচ্ছা হইলে তাহা সংহরণ করিতেও পারে, সেইরূপ পরমেশ্বর আপনার গুণময়ী শক্তি হইতে জগৎ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইচ্ছা হইলে তাহা সেই শক্তিতেই পুনঃ গ্রহণ করিবেন।

অতএব ঈশ্বরের শক্তিই জগতের উপাদান কারণ এবং তাঁহার ইচ্ছার আলোচনা নিমিত্ত কারণ। *

৭৩। উপনিষৎ পরমেশ্বরকে এইরূপ কারণ কহেন। এখন তোমরা তাঁহাকে কি নিমিত্ত কারণ কহিবে; না উপাদান-কারণ কহিবে? কুম্ভকারের যত্নে ও ইচ্ছাতে ঘট সৃষ্টি হয়, কুম্ভকার যেমন সে জন্য ঘটের নিমিত্ত কারণ, ব্রহ্মও সেইরূপ ইচ্ছা ও আলোচনা দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করাতে নিমিত্ত কারণই হইতেছেন। কিন্তু কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা পৃথিবী হইতে আহরণ করে এবং সেই মৃত্তিকাই ঘটের উপাদান অর্থাৎ পরিণামী কারণ হয়, সেরূপ জগৎ-নির্ম্মাণোপযোগী উপাদান সমূহকে পরমেশ্বর অন্যত্র হইতে আহরণ করেন নাই। সে সকল তাঁহারই শক্তিতে অব্যক্তরূপে অবস্থিতি করিতেছিল সুতরাং তাঁহার শক্তি অর্থাৎ তিনিই † জগতের উপাদান-কারণও হইলেন। কিন্তু উপাদানকারণের লক্ষণ এই যে তাহা পরিণামী—যেমন মৃৎপিণ্ড ঘট হইতে হইতে ব্যয় হইয়া যায় অর্থাৎ ঘটরূপে পরিণত হয়, ঈশ্বরকে সেরূপ কারণ বলা যাইতে পারে না। এজন্য বেদান্ত-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে তাঁহাকে বিবর্ত্ত-উপাদান-কারণ বলেন। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছাতে তাঁহার শক্তি হইতেই জগৎ হইয়াছে তাহাতে তাঁহার স্বরূপের ক্ষয়, ব্যয় বা অন্যথা হয় নাই। যেমন রজ্জুতে ভ্রমে অহি-দর্শন হয় সেইরূপ সত্যস্বরূপ পরমাত্মার শক্তিতে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। রজ্জু যেমন সর্প নয়, পরমাত্মাও সেইরূপ জগৎ নন। কিন্তু রজ্জু যেমন মিথ্যা সর্পের বিবর্ত্ত-উপাদান-কারণ,

---

* আমার "সৃষ্টি" দেখহ। অব্যক্ত প্রং।

† "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ।"—জৈমিনিঃ।

পরমাত্মা এই জগতের সেইরূপ বিবর্ত্ত-উপাদান-কারণ। পরমেশ্বর যে স্বয়ং জগৎ হন নাই কিন্তু আপনার শক্তি হইতেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া এই দৃষ্টান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন কোন অদ্বৈতবাদী আচার্য্য ঐ "মিথ্যা সর্পটির" উপলক্ষ করিয়া জগৎকে বাস্তবিক মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ একেবারে মিথ্যা। ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছু থাকিল না। ইহারই নাম অদ্বৈতবাদ। উপনিষদের মধ্যে ইহার পোষকতায় বিস্তর বচন আছে, ফলে জগৎকে একেবারে মিথ্যা বলা সে সব বচনের উদ্দেশ্য নহে। তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মই সারাৎসার, আর সব অসার এবং অনিত্য। "নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (কঠোপনিষৎ ৫ব। ১৩) সমুদয় অনিত্য বস্তুর মধ্যে তিনিই নিত্য এবং তিনি সকল জীবের জীবন।

৭৪। আর এক প্রকার অদ্বৈতবাদ * আছে যাহাতে তাঁহাকে বিবর্ত্ত-উপাদান কারণ না কহিয়া একেবারে পরিণামী কারণ কহে। তাদৃশ অদ্বৈতবাদীরা কহেন যে, এই জগৎ ও জীব সমুদয়ই ব্রহ্ম। তাঁহারাও উপনিষদ্ হইতে বিস্তর বচন প্রমাণ দেন। উপনিষদে তাদৃশ বচনের সংখ্যা অনেক, সত্য, কিন্তু তাহার এমত অর্থ নয় যে, ব্রহ্ম নিজে আসিয়া জগতের প্রত্যেক পদার্থ ও জীব হইয়াছেন। ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব ঘোষণা করাই তাহার উদ্দেশ্য—ব্রহ্ম যে জীবাত্মার অন্তরাত্মা তাহাই দেখান তাহার অভিপ্রায়। "সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম, অয়মাত্মাব্রহ্ম" জগতের সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম,

† শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।

এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই প্রকারের শ্রুতিসকল ব্রহ্মের সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব-প্রতিপাদক ; জগদ্‌ব্রহ্ম ও জীবব্রহ্ম প্রতিপাদক নহে। যে সকল অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মকে বিবর্ত্ত-কারণ বলেন তাঁহারাই অধ্যাস, অধ্যারোপ, ও জগৎ মিথ্যা অঙ্গীকার করেন ; আর যাঁহারা তাঁহাকে পরিণামী কারণ বলেন তাঁহারা ও সকল স্বীকার করেন না। কিন্তু উভয় প্রকার অদ্বৈতবাদীরাই পরমাত্মাকেই জীবের আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। অথচ তাঁহাকে পাপ পুণ্য হইতে নির্লিপ্ত রাখেন। তাঁহারা কেহ জীবকে কেহ বা মনকে অথবা বুদ্ধিকে একটি জড় উপাধিমাত্র বলেন এবং কেবল তাহারই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু উপনিষদে ঠিক ওরূপ ভাবের বচন দৃষ্ট হয় না, তবে পরমাত্মাই কূটস্থ ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জীবের আত্মা, তৎপ্রতিপাদক তত্ত্বমস্যাদি কতিপয় বাক্য আছে। তাহার তাৎপর্য্য পশ্চাৎ বলিব।

৭৫। অতঃপর এইরূপ আর কতকগুলি শ্রুতি আছে যে, মৃত্যুর পর নির্ব্বাণ-মুক্তি-কালে জ্ঞানী ব্যক্তির জীবাত্মা পরব্রহ্মে একীভূত হয়। "কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা, পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি।" মুণ্ডকোপনিষৎ। ৩ম। ২খ। ৭। নির্ব্বাণ-মুক্তি-সময়ে জ্ঞানীর কর্ম্ম ও বিজ্ঞানময় জীবাত্মা এ সমুদয় অব্যয় পরব্রহ্মে একীভূত হয়।* "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বি-মুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং।" ঐ। ঐ। ৮। যেমন নদীসকল সমুদ্রে গমন করত নামরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহা-

* কেবল ভোগমাত্রে সাম্য। ইহার পর ৮২ ক্রমে বেদান্ত সূত্রের ৪অঃ ৪পা ২১ সূঃ অনুবাদ এবং ১৭২ ক্রম দেখহ।

তেই অস্ত হয়; তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষে গিয়া অস্ত হয়েন। এইরূপ শ্রুতিসকল হইতেও আচার্য্যেরা অনেকে আপনাদের শুষ্ক অদ্বৈত মত নিষ্পীড়িত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ঐসকল শ্রুতি প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল ভক্তিবাচক। ব্রহ্ম হইতে আমারদের জন্ম, ব্রহ্মেতেই আমারদের প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মই আমারদের গতি। উপনিষদের যে অদ্বৈতবাদ তাহা অতি প্রেমযুক্ত দ্বৈতবাদ মাত্র। ন্যায় ও বৈশেষিক মতের দ্বৈতবাদকে আপাততঃ যেরূপ শুষ্ক বোধ হয় উপনিষদের ঐ দ্বৈতবাদ সেরূপ প্রেমশূন্য ও শুষ্ক নহে। অদ্বৈত-মতানুসারে অনেকে যেরূপ জগৎকে ও জীবাত্মাকে প্রকৃত মিথ্যা বলিয়া জানেন এবং অনেকে যেরূপ জগৎকে ও জীবাত্মাকে প্রকৃত ব্রহ্মই বলিয়া জানেন, বাস্তবিক, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ সে প্রকার নহে। তাহা প্রেমযুক্ত দ্বৈতবাদ মাত্র। যেখানে প্রেম সেখানে দ্বৈতই অদ্বৈত। পিতা মাতা হইতে সন্তান হয়। সন্তান পিতা মাতার প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বই বল, স্বরূপই বল, আর ছায়াই বল, সে সকল কথার একই তাৎপর্য্য। পিতা মাতা আর সন্তানে ভেদও আছে অভেদও আছে। দুইজনের সম্মিলন ব্যতীত প্রেম হয় না, প্রেম হইলেই দুই জনে অভেদ হইল অথচ তাঁহারা সংখ্যাতে দুই থাকিলেন। উভয় প্রেমিকের মধ্যে ভেদ অভেদ দুই আছে। উপনিষদের মধ্যে ঐরূপ কোথাও জীব ব্রহ্মে ভেদ, কোথাও অভেদ। কোথাও বা সারা জগৎ ব্রহ্মময়। আচার্য্য অনেক, অধিকার ও বুদ্ধিও সকলের সমান নহে; যদিও অবোধ অদ্বৈতবাদীরা সেই প্রেম-সরোবরে মগ্ন না হইয়া তাহার তটে শুক্তি সংগ্রহ

করিয়াছেন; কিন্তু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি স্বর্গীয় আচার্য্যেরা অনেকেই সেই সরস অমৃতমাখা অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অদ্বৈত প্রেমময় দ্বৈতবাদকে বিস্তৃত করিয়াছেন। যাঁহারা নীরস-মত-প্রিয় তাঁহারাই উহার একটি পন্থাকে অন্য পন্থা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া তাহাতেই আবদ্ধ থাকিতে ভাল বাসেন, কিন্তু যাঁহারা উদারচরিত তাঁহারা দ্বৈতা-দ্বৈত-প্রেমসিক্ত ঐ উভয় প্রকার মতকেই এক জ্ঞান করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ও পরম শান্তি লাভ করেন।

৭৬। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ বশতঃ অনেক শ্রুতিকে আপাততঃ যেমন নীরস ও পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আরো অনেক বিষয়ে অনেক শ্রুতি দৃশ্যতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ আছে। মুক্তি, পরলোক ও বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে আপাততঃ সকল শ্রুতির সমান অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় না। কোন শ্রুতি সূর্য্য, বরুণ, অব্যক্ত, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর, অন্ন, প্রাণ, মনঃ ইত্যাদি দেবতার পূজা-প্রতিপাদক; কোন শ্রুতি বিশুদ্ধ-রূপে ব্রহ্ম উপাসনার ব্যবস্থা দেন। কোন শ্রুতি মৃত্যুর পর শরীর হওয়া এবং কোন শ্রুতি তাহা না হওয়া স্বীকার করেন। এই সব কারণে পূর্ব্বকালে নানা পথাবলম্বী ঋষি ও আচার্য্যগণ ও বেদবিরোধী বৌদ্ধেরা অনেকানেক শ্রুতি-বাক্যের নানা অর্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, সেইজন্য সর্ব্বসাধারণের হিতকামনায় শ্রীমন্মহর্ষি বাদরায়ণ উক্ত জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতিসকলের সমন্বয় ও তাৎপর্য্য প্রচার, অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত তাহার বিরোধ-ভঞ্জন, ও কুতর্ক-বাদীদিগের তদ্বিরোধী মত খণ্ডনার্থে শারীরক সূত্র নামে অশেষ-কল্যাণ-

বীজস্বরূপ বেদান্তবিজ্ঞান প্রণয়ন করেন। বেদান্ত-বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক নাম আছে যথা—বেদান্ত সূত্র—বাদরায়ণ সূত্র—বেদান্তমীমাংসা—ব্রহ্মসূত্র—ব্রহ্মমীমাংসা—উত্তরমীমাংসা—উপনিষৎমীমাংসা।

বেদান্ত সূত্র।

সাধারণ বিবরণ।

৭৭। এই শাস্ত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত যথা—সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল। তাহার এক এক অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-প্রতিপাদক চারি চারি পাদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে ১৩৪, দ্বিতীয়ে ১৫৭, তৃতীয়ে ১৮৬, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ৭৮, সর্ব্বশুদ্ধ এই ৫৫৫টি সূত্র শ্রীযুত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মুদ্রিত অধিকরণমালা-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, আর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মুদ্রিত পুস্তকে* তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮৬ সূত্রের পরিবর্ত্তে ১৮৯ সূত্র থাকায় ৫৫৮টি সূত্র পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু বেদান্তের ৫৫০ সূত্রই প্রসিদ্ধ। বোধ হয় ব্যাখ্যানুরোধে কোন কোন সূত্র দ্বিখণ্ড হওয়াতে ঐরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐসকল সূত্র ১৯১টি অধিকরণে বিভক্ত। তাহার এক এক অধিকরণে এক এক ভাবের শ্রুতিসমূহের মীমাংসা আছে। পূর্ব্বোক্ত অধিকরণমালা-গ্রন্থে

---

* ১৭৩৭ শক।

অতি সংক্ষেপে ১৯১ সংখ্যক তাৎপর্য্য দ্বারা সমুদয় বেদান্ত-সূত্র ব্যাখ্যাকৃত হইয়াছে।

৭৮। অপরাপর সূত্রগ্রন্থের ন্যায় বেদান্ত-মীমাংসার সূত্রগুলিও অতি সংক্ষিপ্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাষ্য ও টীকার সাহায্য ব্যতীত ঐরূপ সূত্রসকল প্রায় বুঝা যায় না। কিন্তু ভাষ্য ও টীকাকারদিগের স্ব স্ব মত অনেক স্থলে সূত্র সকলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভাষ্য-কারেরা বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করত তাহার ও জ্ঞানকাণ্ডীয় নানা শ্রুতির মতের সহিত মিশ্রিতভাবে আপনাদের যেরূপ বিস্তীর্ণ বৈদান্তিক মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা পশ্চাৎ বলিব। সম্প্রতি মূল বেদান্তসূত্রের সরল তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ফলে পূর্ব্বাহ্ণে এই কথা মনে রাখা উচিত যে, বেদান্তসূত্র গ্রন্থ কেবল জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতিরই মীমাংসা শাস্ত্র, সুতরাং ইহাতে সূত্র ও অধিকরণ পরম্পরায় ঐসকল শ্রুতিরই মত প্রদর্শিত হইয়াছে। যতদূর সম্ভবে আমি এস্থলে ব্রহ্মবিচার নামক শারীরক মীমাংসা শাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের ও শেষাধ্যায়ের শেষপাদের সমুদয় সূত্রের অধিকরণক্রমে সংক্ষেপ মূল তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতেছি। বেদান্তসূত্রের মধ্যে উপনিষদাদি জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতির অর্থাৎ মূল বেদান্তের যে প্রকার মীমাংসা আছে ইহা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে।

৭৯। বেদান্তসূত্র।—প্রথম অধ্যায়;—প্রথম পাদ।

১ *

চিত্তশুদ্ধির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়॥ ১॥

২

যিনি এই সমুদয় জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের কারণ তিনি ব্রহ্ম॥ ২॥

৩

বেদশাস্ত্র নিত্য নহে। বেদশাস্ত্রের কারণ ব্রহ্ম॥ ৩॥

৪

সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেতে॥ ৪॥

৫। ১১

জড়প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব বেদে কহেন নাই; কেন না "ঈক্ষতি" অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা করে॥ ৫॥

ঐ কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে বেদে আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে। সে আত্মা শব্দে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম। প্রকৃতি নহে। সে কর্ত্তৃত্ব গৌণভাবে প্রকৃতিতে অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না॥ ৬॥

কেননা বেদে চৈতন্যনিষ্ঠেরই মোক্ষ ফল কথিত আছে। জড়নিষ্ঠের নাহি॥ ৭॥

প্রকৃতি যদি সৎশব্দের বাচ্য হইত, তবে বেদে ঐ সৎ শব্দকে হেয় করিতেন, অর্থাৎ অবশ্যই কহিতেন যে উহা ব্রহ্ম নহে। কিন্তু তাহা কহেন নাই। সুতরাং সৎশব্দে ঐ চৈতন্যই বুঝাইবে, প্রকৃতি নহে॥ ৮॥

সৎপদ-বাচ্য অন্তরাত্মাতেই জীবাত্মার লয় হয়, বেদে শুনা

---

* মধ্যভাগের অঙ্কগুলি এক এক অধিকরণ জ্ঞাপক সূত্রের সংখ্যা। অন্তের অঙ্কসমূহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্র সংখ্যা।

যায়। কিন্তু জড়েতে লয়ের শ্রুতি নাই। কেননা তাঁহাতে চেতনস্বরূপ জীবাত্মার জড়ত্ব দোষ ঘটে॥ ৯॥

অতএব চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মারই সর্ব্বত্র সমভাবে জগৎ-কারণত্ব হইতেছে॥ ১০॥

তাঁহারই জগৎকারণত্ব সর্ব্বত্র শুনা যায়। অতএব জড় প্রকৃতি জগৎকারণ নহে॥ ১১॥

১২। ১৯

ব্রহ্মই সাক্ষাৎ আনন্দময়॥ ১২॥

"ময়" শব্দ যেমন বিকারার্থে, সেইরূপ প্রচুরার্থেও প্রয়োগ হয়। অতএব "আনন্দময়" শব্দে আনন্দের প্রচুরতা অভি-প্রায় হয়, বিকার অভিপ্রায় নহে॥ ১৩॥

ব্রহ্মই আনন্দের হেতু। শ্রুতিতে এই রূপ ব্যপদেশ আছে॥ ১৪॥

ইতর অর্থাৎ জীবাত্মাকে আনন্দময় বলা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে॥ ১৫॥

শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মকেই আনন্দময় বলিয়া গান করেন॥১৬॥

বেদে আছে, জীবাত্মার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং বেদে জীবাত্মা আর ব্রহ্মের ভেদ দৃষ্ট হয়। অতএব জীবাত্মা আনন্দময় নহে। ব্রহ্মই জীবাত্মার আনন্দের আধার॥ ১৭॥

জড়-স্বভাবকেও আনন্দময় বলা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে, যেহেতু আনন্দময়ের সৃষ্টিকামনা করা বেদে উক্ত আছে। তাদৃশ কামনা অচেতন স্বভাবের সম্ভবে না॥ ১৮॥

বেদে আছে, ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার যোগ হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মকে লাভ করিলেই জীবাত্মা আনন্দিত হয়েন। সুতরাং ব্রহ্মই আনন্দময়, জীবাত্মা কেবল ভোক্তা॥ ১৯॥

২০। ২১

অন্তর্যামী হওয়া ব্রহ্মের ধর্ম্ম, জীবাত্মার নহে ॥ ২০ ॥

ব্রহ্ম যাহার অন্তর্যামী তাহা হইতে ব্রহ্মের ভেদ-কথন বেদে আছে ॥ ২১ ॥

২২

শ্রুতিতে কোন কোন স্থানে আছে যে, আকাশই লোকের গতি। সে স্থানে আকাশ শব্দে ব্রহ্ম। আকাশ নিরাকার, নির্লিপ্ত, ও বস্তুর আধার বিধায় ব্রহ্মেতে আকাশের উপমা প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

২৩

বেদে ঈশ্বর "প্রাণ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সে প্রাণের অর্থ শারীরিক প্রাণ বা বায়ু নহে। তাহার অর্থ ব্রহ্ম সকলের জীবন ॥ ২৩ ॥

২৪। ২৭

শ্রুতিতে আছে যে এই বিশ্বসংসার "জ্যোতির পাদস্বরূপ" সেস্থলে "জ্যোতিঃ" শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন। সামান্য জ্যোতিঃ নহে ॥ ২৪ ॥

শ্রুতিতে ছন্দঃ অর্থাৎ গায়ত্রীকে ব্রহ্ম কহেন। সেস্থলে অক্ষর-সমূহ-বিশিষ্ট গায়ত্রীমন্ত্র যে ব্রহ্ম এমত তাৎপর্য্য নহে। ব্রহ্মেতে লোকের চিত্তার্পণার্থে গায়ত্রী অবলম্বন মাত্র। অতএব গায়ত্রী ব্রহ্মের প্রতিপাদক, কিন্তু ব্রহ্ম নহে ॥ ২৫ ॥

শ্রুতিতে আছে যে ভূতাদি ঐ গায়ত্রীর পাদস্বরূপ। সুতরাং ঐরূপ গায়ত্রী বাক্যে ব্রহ্মই অভিপ্রেত হইয়াছেন। কিন্তু অক্ষর-বিশিষ্ট ও উচ্চারণ-বিশিষ্ট মন্ত্র অভিপ্রেত হয় নাই। কারণ ভূতাদি তাদৃশ স্থূল গায়ত্রীর পাদ হইতে পারে না ॥২৬॥

শ্রুতিতে আকাশকে কোন স্থানে ব্রহ্মের আধার কোন স্থানে মর্য্যাদারূপে কহিয়াছেন। এরূপ উপদেশ-ভেদ বিরুদ্ধ নহে, একই অর্থ মাত্র ॥ ২৭ ॥

২৮। ৩১

ব্রহ্ম জীবাত্মার প্রাণ, অতএব যেখানে শ্রুতিতে প্রাণকে উপাসনার বিধি আছে, সেখানে, ব্রহ্মোপাসনাই বুঝিতে হইবেক। বায়ু বা প্রাণীর উপাসনা নহে ॥ ২৮ ॥

বক্তা যে আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করেন, তাহার এমত তাৎপর্য্য নহে যে, সেই বক্তার স্বীয় প্রাণ উপাস্য। তাদৃশ স্থলে "প্রাণ" শব্দের তাৎপর্য্যে বহু অধ্যাত্ম সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক অনেক বিশেষণ থাকে। সুতরাং সেখানে প্রাণ শব্দ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক, বক্তার আত্ম-প্রতিপাদক নহে ॥ ২৯ ॥

যেমন বামদেব ব্রহ্মকে আপনার আত্মা জানিয়া কহিয়াছিলেন, আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য হইয়াছি। সেইরূপ, শাস্ত্রানুসারে, বক্তা আপনাকে ব্রহ্মরূপে উপদেশ দেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে সেরূপ বক্তাকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিতে হইবেক এমত তাৎপর্য্য নহে। সেখানে এইমাত্র বুঝিতে হইবেক যে, বক্তা ব্রহ্মকেই আপনার মূল প্রাণ স্বরূপ জানিয়া এবং অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হইয়া আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

যদি শারীরিক প্রাণ অথবা জীবাত্মাকে উপাস্য বলিয়া অঙ্গীকার কর তবে উপাসনা তিন প্রকার হয়। জীবোপাসনা, প্রাণোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা। কিন্তু একমাত্র বাক্য কখনই ঐ তিন প্রকার উপাসনার প্রতিপাদক হইতে পারে না। উহা কেবল একই ব্রহ্ম প্রতিপাদক। ব্রহ্মই শারীরিক প্রাণের ও

জীবাত্মার আশ্রয়, ব্রহ্মদ্বারাই তাহারা জীবিত থাকে। অতএব ব্রহ্ম জীবনের অবলম্বন-স্বরূপ বিধায় ব্রহ্মকেই প্রাণ ও জীবাত্মা পদে বরণ করা হইয়াছে, অথবা, উক্ত কারণে জীবাত্মা ও প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনাই উদ্দেশ্য, কিন্তু শারীরিক প্রাণ অথবা জীবাত্মার উপাসনা উদ্দেশ্য নহে ॥ ৩১ ॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ।]

৮০। যে প্রকার শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়া এই ৩১টি সূত্র রচিত হইয়াছে তাহার প্রতি মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ সূত্রকার প্রথমেই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্র দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে বেদান্ত দর্শনের মূলদেশে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মনিরূপণ করিতেছেন। শ্রুতিতে অনেক দেবতা ও পদার্থকে ব্রহ্ম কহেন। ব্রহ্ম শব্দ মনুপ্রজাপতি, প্রাণ, মন, জীবাত্মা, শব্দ, মন্ত্র, অন্ন, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বহু প্রতিপাদক। অতএব মানব কোন্ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসু হইবেন ? এই আশঙ্কা নিবারণার্থে দ্বিতীয় সূত্রে কহিলেন—"যস্মাদ্যস্য যতঃ"। যিনি ঐ সকল দেবতা ও সকল মানব ও পদার্থের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের কারণ তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু এ কথাতেও সকল সন্দেহ নিরাস হয় না। শ্রুতিতে অনেক স্থলে বেদকে নিত্য কহেন—"বাচা বিরূপনিত্যয়া"—বেদ নিত্য বাক্য। সুতরাং কর্ম্মী বৈদিকগণ যদি এমন মনে করেন যে, ব্রহ্ম সকলেরই কারণ বটেন, কিন্তু বেদের কারণ নহেন; কেন না বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ তাহাকে কেহ সৃষ্টি করেন নাই; এবং নিত্যকাল হইতে আছে। এই সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্তে পরসূত্রে কহিলেন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" শাস্ত্র যে বেদ, তাহা নিত্য নহে,

তাহারও কারণ ব্রহ্ম। বেদ তাঁহার সৃষ্টির বহির্ভূত নহে। তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান-লাভার্থে বেদই কারণ অর্থাৎ প্রমাণস্বরূপ। সৃষ্টিকাল হইতে মানব যে যে প্রকারে তাঁহার জ্ঞান লাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার নিদর্শন বেদেতেই আছে। কিন্তু ইহাতে এই সন্দেহ করিতে পার যে, বেদের মধ্যে নানা দেবতার পূজা ও নানা যজ্ঞের আড়ম্বর আছে, তবে বেদ কেবল ব্রহ্মোপাসনার প্রমাণ কিরূপে হইতে পারে? এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য চতুর্থ সূত্রে কহিয়াছেন—"তত্তু সমন্বয়াৎ" বেদে যত প্রকার উপাসনা আছে, সবই ব্রহ্মের উদ্দেশে। সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য কেবল ব্রহ্মেতে। কোন রূপ-নাম-বিশিষ্ট দেবে, নরে, জীবাত্মাতে বা পদার্থে সে তাৎপর্য্য প্রয়োগ হইতে পারে না। অতঃপর আর এক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, যদি সাংখ্য-বাদীগণ এমত কহেন যে, হাঁ ব্রহ্ম জগতের কারণ বটেন এবং বেদেতে তাঁহার সংবাদ আছে বটে, কিন্তু সে ব্রহ্ম শব্দে অজ্ঞান প্রকৃতি। এ জগৎ কোন জ্ঞানবান্ কারণ হইতে সৃষ্ট হয় নাই। সকল অচেতন স্বভাবের বিকার। ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য সে জড়স্বরূপ প্রকৃতিই এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের কারণ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য তাহাতেই। এই সন্দেহ নিবারণার্থে মহর্ষি বেদব্যাস পঞ্চম হইতে একাদশ সূত্র রচনা করিলেন। "ঈক্ষতের্নাশব্দং" ইত্যাদি। জড়স্বভাবের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব বেদে কহেন নাই। কারণ সৃষ্টির সঙ্কল্প করিবার নিমিত্তে চৈতন্য অপেক্ষা করে, তাহা অজ্ঞানান্ধ প্রকৃতিতে নাই। ইত্যাদি। এই প্রকারে নানা সন্দেহ দূর করিয়া মহর্ষি সূত্রকার জীবাত্মাকেই দ্বৈত ও উপাসক পদে স্থির রাখিয়া কেবল ব্রহ্মেরই উপাসনা স্থাপন করিয়াছেন।

৮১। বেদান্ত-মীমাংসা শাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্র সকলের তাৎপর্য্য ও পরস্পর সম্বন্ধ বর্ণন করিয়া এই-ক্ষণে আমি একেবারে সর্ব্বশেষ অধ্যায়ের অন্তিম প্াদের তাৎ-পর্য্য বলিতেছি। ভরসা করি এই আদি অন্তের তাৎপর্য্য দ্বারা অনেকেই সমস্ত বেদান্ত সূত্রের উদ্দেশ্য ও তন্মীমাংসিত জীব ও ব্রহ্মের দ্বৈত-সত্তা অথচ একত্রাবস্থান প্রেমের সহিত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

৮২। বেদান্ত সূত্র।—চতুর্থ অধ্যায়;—চতুর্থ পাদ।

১।৩

ব্রহ্মলাভই মুক্তি। মানব সেই ব্রহ্মস্বরূপ মুক্তির বিকা-শোন্মুখ কলিকা হৃদয়ে ধরিয়া জন্মগ্রহণ করেন। অজ্ঞান নাশ হইলেই তাহা ভোগ করেন। সেই মুক্তি কোন নূতন পদার্থের ন্যায় লাভ হয় না। পুরাতন বস্তুর ন্যায় তাহা নিত্য সিদ্ধ। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই হৃদয়স্থিত কলিকার বিকাশ হয় এইমাত্র ॥ ১ ॥

অতএব মানবের সর্ব্বদাই মুক্তির অধিকার আছে ॥ ২ ॥

শ্রুতিতে যেখানে আছে যে, জীবাত্মা পরজ্যোতিঃপ্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়, সেখানে সে পরজ্যোতির অর্থ ব্রহ্ম, সামান্য জ্যোতিঃ নহে। যেহেতু তাদৃশ শ্রুতি ব্রহ্মপ্রকরণের অন্তর্গত আছে ॥ ৩ ॥

৪

দেহান্তে মুক্তেরা ব্রহ্মের সহিত অবিভাগরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মসহবাসে আনন্দভোগ করেন ॥ ৪ ॥

৫। ৭

ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এ উভয়ভাব শ্রুতিতে উক্ত আছে।

জৈমিনি বলেন মুক্তেরা ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব লাভ করেন ॥ ৫ ॥

ঔডুলোমী কহেন নির্ব্বিশেষ ভাব লাভ করেন ॥ ৬ ॥

বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর দৃষ্টি-ভেদে বেদে ঐ দুই প্রকারের ব্যব্যস্থা আছে। বস্তুতঃ নির্ব্বি-শেষ ভাবই উপাদেয় ॥ ৭ ॥

৮। ৯

দেহান্তে কেবল সঙ্কল্পের দ্বারাতেই মুক্তের ভোগাদি হয়। বহিঃসাধনের অপেক্ষা থাকে না। যেহেতু শ্রুতিতে কহেন জ্ঞানীর সঙ্কল্প মাত্রে পিতৃলোক দেখা দেন * ॥ ৮ ॥

মৃত্যুর পর স্থূল ইন্দ্রিয়াদি থাকে না, কেবল সূক্ষ্ম-দেহ-বিশিষ্ট আত্মাই থাকে ॥ ৯ ॥

১০। ১৪

বাদরি কহিয়াছিলেন মৃত্যুর পর মুক্তের দেহের অভাব থাকে ॥ ১০ ॥

জৈমিনি কহিয়াছিলেন দেহ থাকে ॥ ১১ ॥

পশ্চাৎ বাদরায়ণ মীমাংসা করিয়াছেন যে মুক্তের সঙ্কল্প-দ্বারা অর্থাৎ ইচ্ছামতে উভয় প্রকারই হয় ॥ ১২ ॥

ইচ্ছামতে মুক্তেরা সঙ্কল্প দ্বারা পরলোকে দেহ সৃষ্টি করত ভোগাদি করিয়া বিরাজ করেন ॥ ১৩ ॥

আবার ইচ্ছামতেই সেই ঐচ্ছিক দেহ উপসংহৃত করিয়া কেবল মানসেই ভোগ সিদ্ধ করেন ॥ ১৪ † ॥

---

* সৃষ্টিগ্রন্থে ৮ ক্রম দেখহ।

† সৃষ্টি ৮ ক্রম দেখহ।

১৫। ১৬

মুক্ত হইলে যে ব্রহ্ম হয় এমত নহে। ব্রহ্ম হইতে মুক্তের অনেক বিশেষ।

প্রদীপের যেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয়, স্বরূপের দ্বারা হয় না; সেইরূপ মুক্তের জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হয়; কিন্তু ব্রহ্ম প্রকাশ ও স্বরূপ উভয়ের দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। এই বিশেষতা শ্রুতি দেখাইতেছেন ॥ ১৫ ॥

সুষুপ্তি, স্বর্গ ও মোক্ষ এই তিনে বিশেষ আছে। সুষুপ্তি-সময়ে জীবাত্মা আপনাতে লয় পায়। স্বর্গসুখ দুঃখমিশ্রিত। মোক্ষ-সময়ে জীবাত্মা আপনাতে সর্ব্বসামঞ্জসীভূত ভাবে মিলিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া দুঃখ-রহিত আনন্দ ভোগ করে ॥ ১৬ ॥

১৭। ২২

শ্রুতিতে আছে যে মুক্তেরা পূর্ণকাম হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন—মনের দ্বারা জগৎ দেখেন—এবং মনের দ্বারা বিহার করেন। এই কথা শুনিয়া যদি এমত আশঙ্কা কর যে, মুক্ত হইলেই একেবারে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়; তাহা ভ্রম। তাহার নিরাস করিতেছেন।

কেবল ব্রহ্মই জগৎকর্ত্তা। মুক্তদিগের জগৎকর্ত্তৃত্ব নাই ও জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি ও ইচ্ছাও নাই ॥ ১৭ ॥

জীবের হৃদয়-মণ্ডল-স্থিত যে পরমাত্মা, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। সৃষ্টি করিবার শক্তি—যাহাকে মায়া বলা যায়—তাহা ব্রহ্মেরই আয়ত্ত, জীবের নহে ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া যে, তাঁহাকে সগুণ কহিবে, তাহা পার না। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ সৃষ্টির বিকারে

লিপ্ত নহেন। মুক্তেরা সেই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন, কিন্তু ব্রহ্ম হন না॥ ১৯॥

প্রত্যক্ষশাস্ত্র শ্রুতি ও অনুমানশাস্ত্র স্মৃতি, উভয়েই উহা দর্শাইতেছেন॥ ২০॥

অতএব ব্রহ্মের সহিত মুক্তের যে সমতা উক্ত আছে তাহা কেবল ভোগ-বিষয়ে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তৃত্ব-বিষয়ে নহে॥ ২১॥

মুক্তদিগের আর জন্ম হয় না। "শব্দেতে" অর্থাৎ শ্রুতিতে এমত উক্ত হইয়াছে॥ ২২॥

[ইতি চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ।]

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ ১ম ও ২য় সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য।

৮৩। এই প্রকার সংক্ষেপ প্রণালীতে শারীরক সূত্রে ব্রহ্মবিচার আছে। কিন্তু ভাষ্যকারগণ উহার এক একটি সূত্র লইয়া নানা প্রকার পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করিয়াছেন—তাহার প্রমাণার্থে নানা শ্রুতির শাসন দিয়াছেন এবং নানা শাস্ত্রের ও নানা বাদীর মত খণ্ডন করিয়া স্ব স্ব মত সংস্থাপন করিয়াছেন। বেদান্ত-বিচার উপলক্ষে প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ আপন আপন দার্শনিক ও পারমার্থিক মত যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন একটু পরেই তাহার সংক্ষেপ বিবরণে প্রবৃত্ত হইব। সম্প্রতি একটী অতিরিক্ত বিবরণ প্রকাশ করা উচিত বোধ হইতেছে। ভাষ্যকারগণ কি প্রকার পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সহকারে সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন তাহারও আভাস জানা প্রয়োজন; এবং বেদান্তসূত্র-গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র, যাহার উপরি আর সমুদয় সূত্রই নির্ভর করে তাহারও ভাষ্যার্থ অবগত হওয়া প্রয়োজন। এই দুই ফল লাভের নিমিত্তে পূজ্যপাদ

শঙ্করাচার্য্য প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের যেরূপ ভাষ্য করিয়াছেন তাহার সামান্য তাৎপর্য্য মাত্র এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি *। যাঁহারা ভক্ত আর উপনিষৎ এবং বেদান্তসূত্র আচার্য্যের নিকট পাঠ করিয়াছেন, ঐ ভাষ্যরূপ শোভাকর অরবিন্দের মকরন্দ-পানে তাঁহারদেরই অধিকার। আমরা ভাষাতে তাহার সামান্য ভাবও প্রকাশ করিতে পারি না।

৮৪। কল্পসূত্র ও বেদান্তসূত্র গ্রন্থসকল অধিকাংশতঃ "অথ" শব্দের সহিত আরম্ভ হইয়াছে। এই "অথ" শব্দের অনেক অর্থ। যথা—অনন্তর, মঙ্গল, আরম্ভ, প্রশ্ন, অধিকার। দৃষ্টান্ত ;—আপস্তম্ব-প্রণীত সময়াচারিক সূত্রগ্রন্থের প্রথম সূত্র—"অথাতঃ সময়াচারিকান্ ধর্ম্মান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ" এখানে অথ শব্দের অর্থ "অনন্তর"। অর্থাৎ আমি শ্রৌত ও গৃহ্য ধর্ম্ম বিবরণের "অনন্তর" এইক্ষণ সময়াচারিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিব। গোভিলের গৃহ্যসূত্রের আরম্ভে আছে "অথাতোগৃহ্যকর্ম্মান্যু-পদেশ্যামঃ" এখানে অথ শব্দে, বেদাধ্যয়নের অনন্তর। শাণ্ডিল্য সূত্রের প্রথমে আছে "অথাতোভক্তিজিজ্ঞাসা" এস্থলে অথ শব্দের অর্থ "অধিকার" অর্থাৎ ভক্তিসাধনের পূর্ব্বে অন্য কোন সাধন প্রয়োজন করে না ; সুতরাং ভক্তি-সাধন কোন সাধনের অনন্তর নহে, উহাতে স্বভাবতঃ সকলের অধিকার আছে। এইজন্য ওস্থলে "অথ" শব্দ "অধিকারার্থ"। মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত পূর্ব্ব-মীমাংসায় প্রথমেই এই সূত্র আছে। "অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসা" অর্থাৎ বেদাধ্যায়নের অনন্তর

* আমার বক্তৃতা-পুস্তকে 'ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার অপসিদ্ধান্ত' বিষয়ক বক্তৃতার ১১ অবধি ১৫ ক্রম দেখ।

ব্যক্তিতে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, কি না, ধর্ম্ম-মীমাংসা-শাস্ত্র অনুশীলনের ও তদনুযায়ী ক্রিয়া কর্ম্ম করার অধিকার জন্মে। সুতরাং এখানেও অথ শব্দের "অনন্তর" অর্থ। ঐ রীতি অনুসারে শারীরক সূত্রের প্রথমেই আছে "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। এখানেও "অথ" শব্দের "অনন্তর" অর্থ। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে যে বিস্তীর্ণ বিচার করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই।—

৮৫। "অথ" শব্দের অর্থ "অনন্তর"। "অতঃ" শব্দের অর্থ "হেতু"। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বাক্যের অর্থ (কর্ম্মে ষষ্ঠী সমাসে) "ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা"। জ্ঞানের ইচ্ছার নাম "জিজ্ঞাসা"। সুতরাং এই শাস্ত্রে ব্রহ্মই জিজ্ঞাসার বিষয়। এস্থানে ভাষ্য-কার প্রথমেই প্রশ্ন করিয়াছেন যে "অথ" শব্দের অর্থ যদি "অনন্তর" হইল আর আর "অতঃ" শব্দের অর্থ যদি "হেতু" হইল, তবে কি কি সাধনের অনন্তর ব্যক্তিতে ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা হয়? এবং কোন্ কোন্ বিষয়ই বা ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু-স্বরূপ? যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্ম করার অনন্তর কি ব্যক্তিতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে? যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্মের জ্ঞানই কি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার হেতু? পূজ্যপাদ ভাষ্যকার এই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পশ্চাৎ আপনিই তাহার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। "ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ" ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্মজ্ঞান অপেক্ষিত বলা ন্যায্য হয় না কারণ অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, কিছুমাত্র যজ্ঞাদি কর্ম্ম অর্থাৎ পূজা অর্চ্চা করে না, অথচ কেবল বেদান্ত পড়িয়াই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়। অতএব কর্ম্মের অনন্তর যে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হয় এমত কোন নিয়ম নাই এবং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার

হেতু নহে। অতঃপর যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে যে অত্যন্ত প্রভেদ আছে, তাহার পাঁচটি হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথমতঃ কর্ম্মের অঙ্গ জ্ঞান নহে; দ্বিতীয়তঃ কর্ম্ম জ্ঞানের অধিকার উৎপাদক নহে, অর্থাৎ যেমন দীক্ষণীয় যাগের অধিকারী হইয়া অগ্নিষ্টোমের অধিকারী হয় তদ্রূপ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্মে অধিকারী হইলেই যে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে এমত নিয়ম নাই। তৃতীয়তঃ কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফল-ভেদ আছে, কর্ম্মের ফল অনিত্য-স্বর্গ কিন্তু জ্ঞানের ফল মোক্ষ। চতুর্থ জিজ্ঞাস্যের ভেদ আছে। অর্থাৎ মহর্ষি জৈমিনির প্রকাশিত পূর্ব্ব-মীমাংসা-শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম কর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা পুরুষ-ব্যাপার-সাধ্য * ও অনিত্য; আর উত্তরমীমাংসাতে জিজ্ঞাস্য যে ব্রহ্ম তিনি পুরুষ-বুদ্ধির অতীত অথচ নিত্য-অনুভব-সিদ্ধ। পঞ্চমতঃ দেব-ক্রিয়ার ও ব্রহ্মজ্ঞানের বিধিরও ভেদ আছে। ধর্ম্ম-বিধি পুরুষকে নিয়োগ করে অর্থাৎ ফল-শ্রুতি বর্ণন করত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেয়, কিন্তু ব্রহ্ম-বিধি প্রত্যক্ষরূপে পুরুষকে ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করায় মাত্র, তদ্ভিন্ন কোন অপ্রত্যক্ষ ফলের আশা দিয়া প্রবৃত্তি দেয় না। যদি ধর্ম্মজ্ঞানের ও ধর্ম্ম কার্য্যের অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা না হইল, তবে কাহার অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা উদয় হয়? শ্রীমান্ ভগবান্ ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চারি প্রকারে চিত্তশুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি জন্মে। ধর্ম্মজিজ্ঞসা হউক বা না হউক। সেই চারিপ্রকার চিত্তশুদ্ধি কি কি, তাহা

---

* এস্থানে বেদানুযায়ী ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠানকেই পুরুষ-ব্যাপার-সাধ্য বলা উদ্দেশ্য—বেদকে নহে। কেন না শাস্ত্রে বেদকে পুরুষ-ব্যাপারের অতীত অপৌরুষেয় কহিয়াছেন।

কহিতেছেন। "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ" কোন্ বস্তু অনিত্য আর কোন্ বস্তু নিত্য; তাহা জানা প্রথম প্রকার। "ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ" ইহলোকে ও পরলোকে যে সাধুকর্ম্মের বা উপাসনার ফল পাইব এরূপ নীচ কামনা ত্যাগ দ্বিতীয় প্রকার। "শমদমাদি" অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, বহিরিন্দ্রিয়ের দমন, সহ্য, ঈশ্বরে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা এই তৃতীয় প্রকার। এবং "মুমুক্ষুত্বং" অর্থাৎ মুক্তির জন্য লালসা চতুর্থ প্রকার। মনে যখন এই সকল পবিত্র ভাব উপার্জ্জিত হয় তখনই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় অনুরাগ জন্মে। ঐ সকল পবিত্রতাই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার হেতু। অতঃপর ভাষ্যকার আরো কহেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্তে ব্রহ্মাশ্রিত অশেষ বস্তুর বিচার অকিঞ্চিৎকর, যেহেতু ব্রহ্মই প্রধান বস্তু। তিনিই যখন জিজ্ঞাসার বিষয় হইতেছেন, তখন যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা ব্যতীত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সম্পন্ন হয় না বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতেছে, সে সমুদয়ই ঐ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার মধ্যে ভুক্ত রহিল। সে সকল আর পৃথক্ রূপে ধরিবার প্রয়োজন নাই। "যথা রাজাসৌগচ্ছতীত্যুক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞোগমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ" যেমন রাজা গমন করিতেছেন বলিলে রাজার পার্ষদদিগেরও গমন বুঝায় তদ্বৎ। শ্রুতিতে আছে "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি" তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম।*

---

* শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, প্রায়শ্চিত্তকর্ম্ম, অনশনাদি-ব্রত প্রভৃতি কৃচ্ছ্র-সাধন সমূহকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতুরূপে গ্রহণ করেন নাই। কেবল পাশ্চাত্য বার্ত্তিক-কার গণের কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিয়াছেন মাত্র। সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসারেও ঐ সকল কর্ম্মকে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারপ্রদ বলা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, উক্ত পরমহংসের ক্রিয়া দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল।

৮৬। প্রথম সূত্রে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার কর্ত্তব্যতা উপদেশ দিয়া ভগবান্ সূত্রকার বেদব্যাস দ্বিতীয় সূত্রে কহিয়াছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ হয় তিনি ব্রহ্ম। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে আপনার যেরূপ অভিপ্রায় লিখেন তাহা এই।— "জন্ম" শব্দের অর্থ উৎপত্তি। "আদি" শব্দে "প্রভৃতি"। অর্থাৎ জন্ম প্রভৃতি, কি না জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ। "জন্মনা লব্ধাত্মকস্য ধর্ম্মিণঃ স্থিতিপ্রলয়সম্ভবাৎ" (ইতি শাঙ্কর ভাষ্য) জন্ম ব্যতিরেকে জীবের স্থিতি ও প্রলয় সম্ভব হয় না। "অস্য" শব্দের অর্থ এই জগৎ। "যতঃ" শব্দের অর্থ যাঁহা হইতে। অর্থাৎ অনেক কর্ত্তৃ ভোক্তৃ (কি না জীব) সংযুক্ত অচিন্ত্য-রচনারূপ এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বকারণ হইতে সম্পন্ন হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য এইরূপে সূত্রের অর্থ করিয়া তৎসম্বন্ধে আপনা আপনি নানাপ্রকারের পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহার অতি সংক্ষেপ বিবরণ প্রদান করিতেছি।

৮৭। অচেতনপ্রধান,* অণু, অভাব, জীব, স্বভাব, হইতে ঐ প্রকার অচিন্ত্য-রচনা জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ফলে এইরূপ যুক্তি সূত্রেতে নাই। যেহেতু বেদান্ত-বাক্যরূপ (উপনিষৎ-বাক্যরূপ) পুষ্প-গ্রথনের জন্যই সূত্র, যুক্তি-গ্রথন জন্য নহে। অতএব সূত্র সকল অবলম্বন করিয়াই বেদান্ত-বাক্যের (অর্থাৎ উপনিষৎ-বাক্যের) বিচার করা গিয়া থাকে। বিচার পূর্ব্বক বাক্যার্থ

---

* অজ্ঞান প্রকৃতি। ৬৮ ক্রমে যে প্রশ্ন আছে, শঙ্কর এখানে তাহার মীমাংসা করিলেন।

অবধারণেতেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। অনুমানাদি প্রমাণান্তর দ্বারা তাহা সম্ভাবিত নহে বটে। কিন্তু বেদান্ত-বাক্যার্থে দার্ঢ্য (অর্থাৎ বেদান্ত যে বলেন যে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট, পালিত ও লয় হয়, সে কথায় সকলেরই দার্ঢ্য কি না বিশ্বাস আছে) এজন্য তদ্‌বিরোধী অনুমানাদি প্রমাণও বিচারের সহায়ার্থ গৃহীত হইয়া থাকে। "শ্রুত্যৈবচ সহায়ত্বেন তর্কস্যাপ্যভুপেতত্বাৎ" শ্রুতিতেও যুক্তি সকল সহায়-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

৮৮। ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ন্যায়* ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে কেবল শ্রুতি মাত্র প্রমাণ নহে। কিন্তু শ্রুতি ও যুক্তি উভয়ই প্রমাণ। নিত্যবস্তুর জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) অনুভবেতেই † পাওয়া যায়। (কতকগুলি শ্রুতি পাঠ করিলে বা শ্রুতিকে মানিলেই যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় এমত নহে, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে বিচার, যুক্তি ও অনুমান দ্বারা শ্রুতির সারার্থ অনুভব করা চাই)। যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে যুক্তি ও অনুভবের কোন প্রয়োজন নাই। সেখানে শ্রুতি অর্থাৎ বেদে যেমন ব্যবস্থা আছে তেমনি করিলেই কার্য্য হয় (একজন অতি মূর্খ যজমানও, মন্ত্রার্থ কিছুমাত্র না বুঝিয়া, কিছুমাত্র হৃদয়-চালনা না করিয়া, পুরোহিতে যেমন নিয়োগ করে তেমনি কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় ব্রহ্মবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অনুভবেতে সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।) স্থাণুতে‡ স্থাণুজ্ঞানই স্থাণুবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান। (তদ্রূপ ব্রহ্মেতে ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। সেই জ্ঞানটি অনুভবেতে পর্য্যবসিত হওয়া চাই।)

---

* অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় ধর্ম্ম।

† "অনুভব" শব্দের অর্থ "হৃদয়ঙ্গম"।

‡ মুড়া গাছ।

৮৯। বেদান্তশাস্ত্র যেমন জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি সমূহের মীমাংসা, সেইরূপ ইহার প্রণীত বিষয় সকল নানা আচার্য্যের ব্রহ্মজ্ঞান প্রণয়নের উপকরণ স্বরূপ। কত আচার্য্যই যে বেদান্তসূত্রের কত প্রকার ভাষ্য ও টীকা করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে কত জ্ঞানী লোকই যে কত পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। সেই সমস্ত গ্রন্থ এইক্ষণে সাধারণতঃ বেদান্তদর্শন নামে প্রসিদ্ধ আছে। ফলে বেদান্তসূত্রের যত ভাষ্য আছে, তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদ-প্রকাশক শাঙ্কর-ভাষ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তৎপরে, বিশিষ্টাদ্বৈত-মত-প্রতিপাদক রামানুজভাষ্য, দ্বৈত-মত-প্রতিপাদক মাধ্বাচার্য্যের ভাষ্য এবং শুদ্ধাদ্বৈত-মত-প্রচারক বল্লভাচার্য্যের ভাষ্যই প্রধান-পক্ষে গণনীয়। শারীরক সূত্র সকল যেরূপ সংক্ষিপ্ত এবং শ্রুতি সকল সহসা যেরূপ নানা ভাবের বোধ হয়, তাহাতে আচার্য্যগণ যে দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি নানা মতে বেদান্তভাষ্য রচনা করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। ফলে তন্মধ্যে অদ্বৈত-প্রতিপাদক সমস্ত ভাষ্যেই গূঢ়ভাবে দ্বৈতবাদই রহিয়াছে। না বুঝিয়া অনেকেই তাহার উপরিভাগ হইতে নীরস অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়া এবং অনেকে তাহার ঐরূপ বাহ্য শুষ্কতা দৃষ্টে অশ্রদ্ধাবশতঃ তাদৃশ শাস্ত্র সকলকে একেবারে ত্যাগ করত তদ্‌গর্ভনিহিত অমৃতরসে বঞ্চিত হয়েন। শ্রীমান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈত মতের প্রধান প্রচারক। আজ্ কাল লোকের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে যাহা কিছু পুঁজি, শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যগণের কৃত ভাষ্য ও টীকা সকলই তাহার মূলধন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তাদৃশ অদ্বৈতমতাভিমানী লোক সকল অদ্বৈত জ্ঞানের কিছুমাত্র রস পান নাই। তাঁহারা ও তাঁহাদের বিরোধী-পক্ষ দ্বৈতবাদীরা উক্ত মতকে যেরূপ শুষ্কভাবে গ্রহণ

বা শুষ্কতা জন্য ত্যাগ করিয়াছেন অদ্বৈত-প্রতিপাদক কোন শাস্ত্রের সেরূপ নীরস ভাব নহে। অতএব শঙ্করাচার্য্যের ও তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণের গ্রন্থাবলিতে যে পরম গূহ্য প্রেম-পীযূষাভিষিক্ত দ্বৈতবাদই উপদিষ্ট হইয়াছে, বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদে তাহাই দর্শাইতেছি। ভরসা করি তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই ভ্রম নিরাকৃত হইবে।

শাঙ্কর-ভাষ্য অথবা অদ্বৈত-বাদ।

সাধারণ বিবরণ।

৯০। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্রের যে ভাষ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা শাঙ্কর-দর্শন বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি শকাব্দা সপ্তম শতাব্দীর শেষ অংশে আবির্ভূত হন, সুতরাং সহস্রবর্ষ অতীত হইল তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন। যে কীর্ত্তি তিনি ধরণীতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মানবকুল কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। কি আশ্চর্য্য! সহস্র বর্ষ গত হইল, তথাপি তাঁহার কীর্ত্তির গুণে বোধ হয় যেন তিনি শতবর্ষ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার নিবাস দক্ষিণদেশে। পিতার নাম বিশ্বজিৎ এবং মাতার নাম বিশিষ্টা ছিল। শ্রীমান্ শঙ্কর যে প্রণালীতে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন তাহার আদর্শ ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। উক্ত ভাষ্যেতে তাঁহার যেরূপ দার্শনিক ও পারমার্থিক মত প্রকাশিত আছে তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এখন বলিতেছি।

৯১। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক ও পারমার্থিক মত সার্দ্ধপঞ্চশত ব্যাস-সূত্রের ভাষ্যেতেই অধিকাংশ প্রকাশ পাইয়াছে *। মহর্ষি ব্যাসদেবের মূল সূত্র সকলের যে আদিম সরল ভাব, যদিও তাহা শঙ্কর অনেক স্থানে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অনেক স্থলে আবার তিনি তাহা রক্ষা করার নিমিত্তে কর্ম্মী সাংখ্য, কাণাদ, বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকদিগের সহিত ঘোরতর বিচার উত্থাপিত করিয়া স্বীয় ভাষ্যকে এতাদৃশ দুর্ব্বোধগম্য করিয়াছেন যে, সেই সকল বাদীদিগের মত কিছু কিছু না জানিলে তাঁহার বিচার সমূহ ভেদপূর্ব্বক তাঁহার মত উদ্ধার করা সহজে সম্ভবে না। ইহা ব্যতীত, জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি সকলের মীমাংসার্থেই বেদান্তসূত্র। সুতরাং শঙ্কর প্রত্যেক সূত্রের ভাষ্যে যে সকল শ্রুতি প্রয়োগ করিয়াছেন, মূল উপনিষদে, ব্রাহ্মণে ও মন্ত্রবর্ণে তাহার কিরূপ প্রয়োগ আছে, তাহা না জানিলে, শাঙ্কর-ভাষ্য বিশদরূপে বুঝা যায় না। অতএব শঙ্করের মত জানিতে হইলে অগ্রে শ্রুতির মর্ম্মজ্ঞ এবং সাংখ্য প্রভৃতি বাদিগণের মত সকল জ্ঞাত হইতে হইবেক। যাহাতে সেই সকল বার্ত্তা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানা যায়, এ নিমিত্তে আমি এই সংগ্রহে তৎসমুদয়ের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত দিয়াছি।

৯২। বর্ত্তমানকালের প্রয়োজন অনুসারে শঙ্করের যে সকল দার্শনিক ও পারমার্থিক মত জানা আমাদের উচিত, তাহা আমি তাঁহার ভাষ্য হইতেই উদ্ধার পূর্ব্বক নিবেদন করিব। কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে, তাঁহার বিচার-প্রণালীর সহস্র সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও তাঁহার মত প্রায়ই মূল সূত্র ও শ্রুতির অনুযায়ী। ফলে তাঁহার ভাষ্যে তাঁহার যে সকল সূক্ষ্ম দার্শনিক

* উপনিষৎ সমূহের ও গীতার ভাষ্যেতেও তাঁহার মত প্রকাশিত আছে।

প্রয়োগ আছে, অথবা তাঁহার অদ্বৈতবাদের মূল অভিপ্রায় সকল ব্যাখ্যা করিবার ছলে নবীন অদ্বৈতবাদিরা স্ব স্ব গ্রন্থে যে সকল বৈদান্তিক প্রয়োগ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অগ্রেই বুঝা উচিত। সেই সকল প্রয়োগ এক একটি পারিভাষিক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে যথা—মায়া, আবিদ্যা, সমষ্টি, ব্যষ্টি, পঞ্চকোষ, উপাধি, অধ্যাস, অপবাদ-ন্যায়, অধ্যারোপ-ন্যায়, আবরণ-শক্তি, বিক্ষেপ-শক্তি, ঈশ্বর-চৈতন্য, জীব-চৈতন্য, তুরীয়-ব্রহ্ম-চৈতন্য, কূটস্থ-চৈতন্য, আভাস-চৈতন্য • এবং তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য।—এইসকল শব্দের অর্থবোধ হইলে অদ্বৈত-প্রতিপাদক বেদান্ত-দর্শনে প্রবেশাধিকার জন্মে।

মায়া ও অবিদ্যা।

৯৩। এ জগৎ ছিল না। ইহাকে সৃষ্টি করিবার শক্তি পরমেশ্বরেতে ছিল। কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তিই যে সৃষ্টি-শক্তি তাহা নহে। তাঁহার এক বিন্দু শক্তি মাত্র জগতের প্রসূতি। সেই শক্তির নাম প্রকৃতি।*

৯৪। পরমেশ্বর সত্তা ও স্বরূপে সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার বাহির নাই। সবই তাঁহার মধ্যগত। অতএব জগৎ-রচনার সমুদয় কর্ত্তৃত্ব তাঁহার মধ্যগত। কোন কোন বাদীরা যেমন কহেন যে, জগতের উপাদান সকল, যথা পরমাণু ও জীব, পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ছিল, তিনি তাহাদিগকে যোজনা করিয়া জগৎ করিলেন, বেদান্তদর্শন তাহা বলেন না। বেদান্ত বলেন যে, পরমেশ্বরের সৃষ্টি-শক্তি অনির্ব্বচনীয়, তাহার দ্বারা

---

* আমার সৃষ্টিগ্রন্থে হিরণ্যগর্ভ প্রং দৃষ্টি করহ।

তিনি কর্ত্তৃত্ব ও উপাদান উভয়ই সৃষ্টি করিতে পারেন এবং সেই কর্ত্তৃত্ব ও উপাদান উভয়কে সংযোগ পূর্ব্বক এই অচিন্ত্য-রচনা বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ভাবের ভাবুক হইয়া আচার্য্যেরা কহিয়াছেন যে, তিনি আপনি যেমন কর্ত্তা, সেই রূপ আপনিই কার্য্যরূপ।*

৯৫। বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনায় ঐ ভাবটিকে ক্ষণ-কালের নিমিত্তে বিস্মৃত হইলেও নানা ভ্রম আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিবে। অতএব আমি ঐ ভাবটি স্থির রাখিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

৯৬। পরমেশ্বর প্রকৃতির সহিত আপনি যখন কর্ত্তা-রূপ হন, তখন ঐ প্রকৃতিকে "মায়া" কহা যায়। আর যখন প্রকৃতির সহিত কার্য্য-রূপ হন তখন ঐ প্রকৃতিকে "অবিদ্যা" বলে।

৯৭। কারণ-রূপা প্রকৃতি যে মায়া তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব, এবং কার্য্য-রূপা প্রকৃতি যে অবিদ্যা তাহার নিকৃষ্টত্ব কথিত হয়। তদনুসারে মায়াকে 'বিশুদ্ধ-সত্ব-প্রধান' অথবা 'নির্ম্মল-সত্ত্ব-গুণ-বিশিষ্ট' কহিয়াছেন। এবং অবিদ্যাকে 'তমোমিশ্রিত সত্ত্বপ্রধান' অথবা 'মলিন-সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট' বলিয়াছেন। অ-বিদ্যারও আবার উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট অংশ আছে। সেই উৎকৃষ্ট অংশে জীবের উৎপত্তি হয়† এবং অপকৃষ্ট অংশে জীবের ভোগার্থে ঈশ্বরের আজ্ঞায় পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

---

* এই অবস্থায় পরমেশ্বর সাধারণতঃ 'সম্ভূতি,' 'হিরণ্যগর্ভ,' বা 'কার্য্যব্রহ্ম' নামে অভিহিত হন। (ঈশা ১২—১৪)

† আমার সৃষ্টিগ্রন্থে ২৮।২৯ ও ৭৭।৭৮ ক্রম দেখহ। অর্থাৎ নিকৃষ্ট প্রকৃতি হইতে জড় এবং উৎকৃষ্ট হইতে জীব হইয়াছে।

৯৮। জগৎ-কার্য্যরূপা প্রকৃতি যে অবিদ্যা, জীব তাহারই মধ্যে আচ্ছন্ন। সুতরাং আপনি ব্রহ্মস্বরূপোৎপন্ন হইয়াও আপনাকে বা ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। ভ্রমে অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করে। অবিদ্যার এই আচ্ছাদক শক্তির নাম "আবরণ-শক্তি" এবং ঐ ভ্রমের নাম "অধ্যাস"। তদ্বিষয়ে পরে উক্ত হইবে। এই ভাবে অবিদ্যার প্রচলিত অর্থ অজ্ঞান। যথার্থ সত্য বস্তু যে পরমাত্মা; তাঁহার অবধারণই জ্ঞান ও বিদ্যা।

৯৯। বাজসনেয়-সংহিতোপনিষদে "অবিদ্যা" ও "বিদ্যার" আর এক প্রকার অর্থ পাওয়া যায়। "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততোভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।" যাহারা ("অবিদ্যাং" কি না, বিদ্যায়াঃ অন্যাং কর্ম্মেত্যর্থঃ তাং অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলাং উপাসতে) কেবল যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত যে লোক তাহাতে গমন করে। আর, যাহারা ("বিদ্যায়াং রতাঃ" কি না, দেবতা-জ্ঞানে অভিরতাঃ) কেবল দেবতা-জ্ঞানে রত হয়, তাহারা তাহা অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত যে লোক তাহাতে গমন করে। এই বচনে এবং ইহার পরবর্ত্তী আরো কয়েকটি বচনে, "অবিদ্যা" শব্দে যজ্ঞাদি কর্ম্ম এবং "বিদ্যা" শব্দে দেবতার জ্ঞান বুঝায়; কিন্তু উভয়ই নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করভাষ্যে অবিদ্যার অর্থ ব্রহ্মকে না জানা, এবং বিদ্যার অর্থ তাঁহাকে জানা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীমান্ সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রণীত বেদান্তসার-গ্রন্থে "অবিদ্যা" শব্দ নাই। তথা, যে অজ্ঞানের ব্যষ্টি আর সমষ্টি দুইটী অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে

তাহাই পঞ্চদশীতে ক্রমে মায়া এবং অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উপরি উক্ত বচনটি হইতে অনুমান হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞাদি কর্ম্ম, 'অবিদ্যা' কি না, অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিল। তৎকালে অগ্নিহোতৃ-কর্ম্মীগণ হইতে ভিন্ন এবং উপনিষৎ-মতাবলম্বী ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেও ভিন্ন একটি মাধ্যমিক সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁহারা পরমেশ্বর হইতে পরমেশ্বরের শক্তিকে পৃথক্ করিয়া সেই শক্তির ও হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মার উপাসনা করিতেন। সেইপ্রকার দেবতা-জ্ঞানকে উক্ত মাধ্যমিক উপাসকেরা "বিদ্যা" বলিয়াই জানিতেন। ফলে সে বিদ্যা ব্রহ্ম-বিদ্যা নহে।

সমষ্টি ব্যষ্টি।

১০০। 'সমষ্টি' শব্দে সমুদায়। 'ব্যষ্টি' শব্দে সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক। সমুদায় জীবের সৃজন পালনে যে মায়া নিযোজিত আছে তাহাই সমষ্টি। এবং প্রত্যেক জীবে যে অবিদ্যা কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে তাহাই ব্যষ্টি। শরীর ত্রিবিধ; কারণ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল। জীবাত্মার মূল-বীজ অবস্থা যাহা অবিদ্যা-প্রকৃতির ক্রোড়ে অব্যক্ত থাকে—যথা সুষুপ্তি সময়ে *—তাহাকে কারণ-শরীর বলে। সমুদয় জীবাত্মার, প্রকৃতির ক্রোড়স্থ সেই অব্যক্ত অবস্থাতে পরমেশ্বর যখন কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্বে উপহিত থাকেন তখন তাঁহাতে সমষ্টি ভাবের প্রয়োগ হয়। সেই সমষ্টি অবস্থাতে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়। এবং প্রত্যেক জীবের তাদৃশ অব্যক্ত অবস্থাতে

---

* অথবা জীব-সৃষ্টির প্রাক্‌কালে জীবের প্রকৃতি-নিহিত অব্যক্ত অবস্থায়।

ব্যষ্টিভাবে এবং কার্য্যরূপে তাঁহাকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। আর জীবাত্মার অপেক্ষাকৃত ব্যক্ত অবস্থায় যে বুদ্ধি, মন, অহংকার ও ইন্দ্রিয়ের উদয় হয়—যথা স্বপ্নকালে* তাহাকে সূক্ষ্ম-দেহ অথবা লিঙ্গশরীর কহে। সমুদয় জীবের লিঙ্গশরীর-সমষ্টিতে বর্ত্তমান ঈশ্বরকে হিরণ্যগর্ভ বলা যায় এবং প্রত্যেক লিঙ্গদেহে তাঁহাকে কার্য্যরূপে তৈজস বলে। জীবাত্মার চূড়ান্ত ব্যক্তাবস্থায় স্থূলদেহের যোগ হয়—যথা জাগ্রত-কালে†। সকল জীবের স্থূলদেহে ঈশ্বর সমষ্টিভাবে "বিরাট" এবং প্রত্যেক স্থূলশরীরে ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে কার্য্যরূপে "বিশ্ব" ইত্যাদি পারিভাষিক নাম দ্বারা পরিচিত হন। উক্ত সমষ্টিতে কর্ত্তৃত্বরূপে বর্ত্তমান, আর ব্যষ্টিতে কার্য্যরূপে বর্ত্তমান একই পরমেশ্বর। সমষ্টিতে কর্ত্তৃত্ব স্বরূপে তিনিই ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট; ব্যষ্টিতে কার্য্যরূপে অর্থাৎ জীবস্বরূপে তিনিই প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব।‡ এতাবতা অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মতে সমষ্টিতে বর্ত্তমান চৈতন্য কর্ত্তা এবং ব্যষ্টিতে বর্ত্তমান চৈতন্য কার্য্য। অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তা, জীব কার্য্য। কিন্তু স্বরূপে উভয়ে একই।¶ কেবল উপাধিতে§ প্রভেদ। "কার্য্যোপাধিরয়ং জীব-কারণোপাধিরীশ্বরঃ"। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের শারীরক সূত্রের

---

* অথবা সৃষ্টি-সময়ে সূক্ষ্ম-দেহ-রচনা-কালে।

† অথবা সৃষ্টিকালে স্থূল-দেহ-প্রকাশ-সময়ে।

‡ ঈশোপনিষদে এবং অন্য কোন কোন স্থলে এই সকল উপাধির ভেদ আছে। সাধারণ এই শেষোক্তগুলি 'কার্য্যব্রহ্ম' বা 'হিরণ্যগর্ভ' বলিয়া উক্ত হয়।

¶ আমরা জীবাত্মা শব্দে মানবের যে স্বাধীন চৈতন্যকে বুঝি তাহাকে ঈশ্বরের সহিত এক বলা যে, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে তাহা পরে ক্রমে ক্রমে দেখাইব। বিশেষতঃ ১৬৩ ক্রম দেখ।

§ উপাধি শব্দের ব্যাখ্যা পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যে ইত্যাকার ব্যষ্টি সমষ্টির বিবরণ নাই, কিন্তু ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও প্রাজ্ঞ প্রভৃতির উল্লেখ অনেক স্থলে আছে। এইরূপ ব্যষ্টি সমষ্টির জ্ঞান ব্যতীত তাহা বুঝা যায় না। পঞ্চদশী ও বেদান্তসারে এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ আছে। উপনিষৎ, বোদান্তসূত্র এবং শাঙ্কর ভাষ্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিবরণ অবগত হওয়া উচিত।

পঞ্চকোষ।

১০১। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান দিবার নিমিত্তে পুরুষ অর্থাৎ জীবকে পঞ্চস্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থূলদেহ হইতে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা সুসূক্ষ্ম অবয়বে জীবাত্মার অধিকতর প্রবাহ জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রথমতঃ জীবাত্মাকে অন্ন-রস-ময় অর্থাৎ স্থূল-শরীর-ময় বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ বলিয়াছেন যে, তাহা অপেক্ষাও অভ্যন্তর-প্রদেশ প্রাণ—সেইখানেই জীবাত্মার অধিক প্রবাহ—অতএব তিনি "প্রাণময়"। তৃতীয়তঃ প্রাণাপেক্ষাও যে সূক্ষ্মস্থান মনঃ, জীবাত্মার বিশেষ স্থান সেই মনেতেই নির্দ্দেশ করত তাঁহাকে "মনোময়" কহিয়াছেন। চতুর্থতঃ কহিয়াছেন যে, তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও আভ্যন্তরিক স্থান বুদ্ধি অথবা বিজ্ঞান। অতএব জীবাত্মার মুখ্য স্থান সেখানে। সুতরাং তিনি "বিজ্ঞানময়"। পঞ্চমতঃ কহিয়াছেন যে, বিজ্ঞানেরও অন্তরালে জীবাত্মার প্রকৃত স্থান। তথায় জীবাত্মা নিজ প্রীতি, মোদ, প্রমোদ এবং আনন্দে কর্তৃত্ব করেন। সেই অবস্থাই তাঁহার বীজভাব।—অতএব তিনি "আনন্দময়"। উক্ত উপনিষৎ এই বিশুদ্ধ জীবাত্মাকে মনোহর

সাজে সজ্জিত করিয়াছেন। যথা "প্রিয়" তাঁহার মস্তক, "মোদ" দক্ষিণ বাহু, "প্রমোদ" বামবাহু, "আনন্দ" মধ্যদেহ। ব্রহ্ম তাঁহার প্রতিষ্ঠাজনক পুচ্ছ। "প্রতিষ্ঠাজনকপুচ্ছ" এ বাক্যের অর্থ আশ্রয়। এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মার যে বিশুদ্ধভাব, ব্রহ্মকে সেই ভাবের সন্নিধানেই প্রতিষ্ঠাস্বরূপে দৃষ্ট হয়। নতুবা বিজ্ঞান, মন, প্রাণ, ও শরীরে এবং বিজ্ঞানের অতীত অভ্যন্তরস্থ জীবাত্মার প্রিয়-মোদাদি বৃত্তিতেও তাঁহাকে দৃষ্ট হয় না। ঐ শেষোক্ত ভাবের পুচ্ছদেশে অর্থাৎ পশ্চাৎভাগে তাঁহাকে জীবাত্মার অব্যবহিত প্রতিষ্ঠারূপে লাভ করা যায়। যিনি তত দূরে আপনার জ্ঞান-দৃষ্টি প্রেরণ করিতে না পারেন তাঁহার সম্মুখে জীবাত্মার প্রাগুক্ত "অন্নময়" অবধি "আনন্দময়" পর্য্যন্ত এই অবস্থা-পঞ্চ উত্তরোত্তর এক এক "আবরণ" স্বরূপ। এই নিমিত্তে ঐ সকল অবস্থা বা স্থানকে পঞ্চকোষ বলিয়াছেন। যিনি জ্ঞানযোগে এই পঞ্চকোষ অতিক্রম করিতে পারেন তিনিই আপনার প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ পরমাত্মাকে দৃষ্টিপূর্ব্বক তাঁহার সত্তাতে আপনার সত্তা বুঝিতে অথবা তাঁহার দর্শনে আত্মবিস্মৃত হইয়া কেবল তাঁহারই সত্তা অনুভব করিতে পারেন।

১০২। মহর্ষি ব্যাসদেবের শারীরক সূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের ১২ অবধি ১৯ সূত্র পর্য্যন্ত উপরি উক্ত পঞ্চ কোষের উল্লেখ আছে। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার ভাষ্যে ইহাই মীমাংসা করিয়াছেন যে, অন্নময় কোষাবধি আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত যে আত্মা উক্ত হইয়াছে তাহা অমুখ্য অর্থাৎ ক্ষুদ্রাত্মা (জীবাত্মা) আর তাহার পুচ্ছরূপে যিনি উক্ত হইয়াছেন তিনিই মুখ্যাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। তিনি আনন্দ আর জীব

সেই আনন্দের ভোক্তা। ব্রহ্মকে জীবের পুচ্ছ বলাতে যদি কেহ তাঁহাকে জীবের অভেদাঙ্গরূপে আশঙ্কা করেন, এজন্য শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যেতে লিখিয়াছেন যে "এই প্রত্যক্ষ যাহা কিছু এ সমুদয়ই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম যদি সকলের কারণ হইলেন, তবে আর স্বসৃষ্ট আনন্দময়ের (জীবাত্মার) মুখ্য অবয়ব (অভেদাঙ্গ) হইতে পারেন না।"* অতএব পুচ্ছ শব্দে জীবের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ "স্বপ্রধান ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইয়াছেন,"† এবং তিনি জীব হইতে স্বতন্ত্র।

১০৩। পঞ্চদশী কহেন যে স্থূল শরীরই অন্নময় কোষ। প্রাণময় কোষ প্রাণাত্মক। তাহা স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালন করে। মনোময় কোষই অহংজ্ঞানের কর্ত্তা এবং বাহ্যকরণস্বরূপ। বিজ্ঞানময় কোষ বুদ্ধি শব্দের বাচ্য। উহা অন্তরেতে কর্ত্তৃত্ব করে এবং জ্ঞাতাস্বরূপ। আনন্দময় কোষ ভোক্তা। উহাই জীবাত্মার বিশুদ্ধ অবস্থা। উহা পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ কালে চিদানন্দ-প্রতিবিম্ব-বিশিষ্ট। প্রকৃতিতে লীন আন্তরিক বুদ্ধিবৃত্তি স্বরূপ। ব্রহ্ম উহার ভোগ্য।‡ সুতরাং জীব ব্রহ্ম নহে।

উপাধি।

১০৪। পরমাত্মার যে অসীম অংশ সৃষ্টি-কার্য্যে অবতীর্ণ হয় নাই তাহাতে সৃষ্টির কোন লক্ষণের সংশ্রব নাই।

* শ্রীযুত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রকাশিত শঙ্করভাষ্য দৃষ্টি কর—১৩৬ পৃঃ ১৭৮৪ শক।

† ঐ ঐ ১৩৫ পৃঃ ঐ—

‡ পঞ্চকোষ বিং। যোগানন্দ ১৫ ও ৬৭।

সুতরাং মনুষ্যের জানিত কোন লক্ষণ দ্বারা তাঁহার সেই অসীম ভাবকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। তাদৃশ অবস্থায় তাঁহাকে নিরুপাধি কহে। কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া আমরা পরমাত্মাকে জগৎকারণ প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া থাকি। প্রকৃতি যে তাঁহার সৃষ্টি-শক্তি, বিবেচনা করিতে গেলে তাহারই সহিত ঐ সম্বন্ধের প্রথম সূত্রপাত। সুতরাং প্রকৃতিই যাবদীয় উপাধির মূল। আকাশ, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চ ভূত উপাধিস্বরূপ, এই সমস্ত জড়জগৎ উপাধিস্বরূপ, জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ-দেহ উপাধিস্বরূপ এবং পরমেশ্বর এই সর্ব্বত্রে ঔপাধেয়। এই সকল উপাধি তাঁহারই সৃষ্ট। এ সকল কিছুই ছিল না। তাঁহারই শক্তির অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং তাঁহার সত্তাতেই উহাদের সত্তা। এইরূপ যুক্তিতে বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের মতে ব্রহ্মের সহিত সমস্ত জগৎ অভেদ—সমস্তই ব্রহ্মভুক্ত। কিছুই বিভক্ত হইয়া স্থিতি করে না। সকলই ব্রহ্ম-শক্তির আবির্ভাব। যখন এইরূপ শুভদৃষ্টি জীবেতে উদয় হয় তখন ঐ সকল উপাধিকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। নতুবা ব্যবহারিক অবস্থায় বেদান্তের মত এই যে, ঐ সমস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপেই সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহারা যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ এই বোধ সকলেরই থাকিবে।

১০৫। বেদান্ত শাস্ত্রে কহেন যে ঐ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাধিতে ব্রহ্ম সগুণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। অবিদ্যাবচ্ছিন্ন স্বীয় সৃষ্ট জীবের কারণ-শরীরে তিনি প্রাজ্ঞ নামে, সূক্ষ্মদেহে তৈজস নামে, স্থূলদেহে বিশ্বনামে জীবরূপে প্রকাশ পান এবং সর্ব্ব-জীবের কারণ-শরীর-সমষ্টিতে তিনি সর্ব্বেশ্বর নামে, সূক্ষ্ম-দেহ-সমষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ, ও স্থূল-দেহ-সমষ্টিতে বৈশ্বানর নামে

নিয়ন্তা ও নিমিত্ত-কারণ-স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মতে জীবের ঐ ত্রিবিধ দেহরূপ উপাধিতে ব্রহ্মই স্বয়ং জীবরূপে প্রকাশ পায়েন। নৈয়ায়িক যে ভাবে জীবকে স্বতন্ত্র ও উৎপত্তি-বিহীন বলেন, বেদান্ত তাহা বলেন না। বেদান্ত-মতে কিছুই ব্রহ্মের বাহিরে নাহি। কিছুই ব্রহ্মের বাহির হইতে আসে নাই। সকলেতেই তাঁহার স্বীয় যোগ রহিয়াছে। তিনি সর্ব্ব পদার্থে সত্তারূপে বর্ত্তমান। তাঁহার সত্তাতে সকলের সত্তা সুতরাং সকলই তিনি। তাঁহার সত্তার অভাব হইলে সকলই ইন্দ্রজালবৎ তিরোহিত হইবেক। যেখানে যেমন প্রয়োজন তথা তিনি সেইভাবে বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্ব পদার্থে যদিও সত্তারূপে আছেন; কিন্তু স্ব-সৃষ্ট স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-দেহের উৎকৃষ্টতা জন্য তাহাতে জীবরূপে * প্রকাশমান। তিনি সেইরূপেই আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সৃষ্টির কারণ স্বরূপে আপনি যেমন সর্ব্বজ্ঞ—জীব-রূপে আপনাকে তেমন সর্ব্বজ্ঞ করেন নাই। সে অবস্থায় অল্পজ্ঞ হইয়াছেন। সে অবস্থায় অন্তঃকরণরূপ উপাধির যোগে তিনি সুখ দুঃখ ভোগ করেন। জন্ম জন্মান্তর পরি-ভ্রমণ করেন এবং পাপপুণ্য ভোগ করেন।

১০৬। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের এই সাধারণ মত। এই প্রকার মতের মূল অভিপ্রায় যাহা তাহা পরে বলিব †। এখন এই বিবরণ হইতে "উপাধি" শব্দের এই মাত্র তাৎপর্য্য

---

* অর্থাৎ জীবের মুখ্যাত্মারূপে। কিন্তু কার্য্যকারণের অভেদ-লক্ষণায় কার্য্যের অল্পত্ব কারণ-স্বরূপ ঈশ্বরে আরোপিত হইয়াছে। ১০৭ ক্রম দেখহ।

† ইহার অভিপ্রায় পশ্চাৎ ক্রমেই জানা যাইবে। বিশেষতঃ ১৬৩ ক্রমে দেখিবে।

বুঝিয়া রাখা উচিত যে, যেমন ধূমবান্ বহ্নির উপাধি আর্দ্র-কাষ্ঠ, সেইরূপ পরমাত্মার জীবভাবের উপাধি অবিদ্যা এবং তদন্তর্গতঃ দেহ ও অন্তঃকরণ, আর ঈশ্বর-ভাবের উপাধি মায়া ও তদন্তর্গত সমুদয় জগৎ-কার্য্য।

অধ্যাস।

১০৭। এক বস্তুতে অন্যবস্তুর জ্ঞানের নাম অধ্যাস। যথা শুক্তিকাতে রজতজ্ঞান ; রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ; স্থাণুতে* পুরুষ-জ্ঞান ; দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণেতে আত্মা-জ্ঞান এবং আত্মাকে দেহেন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ জ্ঞান ; জীবেতে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মেতে জীবজ্ঞান। শঙ্করাচার্য্য স্বীয় বেদান্ত-ভাষ্যের ভূমিকাতে লিখিয়াছেন যে, "পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণরূপ সময়ান্তরে তাহার যে আভাস অনুভব, তাহাকে অধ্যাস কহে"। ফলতঃ "সাদৃশ্য ব্যতীত অধ্যাস হয় না" †। শুক্তিকাতে রজতের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই একের ধর্ম্ম অন্যেতে অধ্যস্ত হইয়া থাকে। জীবেতে ব্রহ্মের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই তাঁহাদের ধর্ম্মের পরস্পরাধ্যাস হয়। এই "অধ্যাস" শব্দের আর এক প্রতিশব্দ "আরোপ"।

১০৮। শ্রীমান্ সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার-গ্রন্থে এ সম্বন্ধে "অধ্যারোপ-ন্যায়" এবং "অপবাদ-ন্যায়" এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত আছে। এই দুইটি শব্দ উপলক্ষ করিয়া তিনি ব্রহ্মের বস্তুত্ব এবং জগতের অবস্তুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার মতে "অধ্যারোপ-ন্যায়" দুই প্রকার, যথা সামান্যতঃ ও বিশে-

* মুড়াগাছ। † শাঙ্করভাষ্য ১।১।২৪ সূ। পঞ্চদশী ৬।৩৮।

যতঃ। ব্রহ্ম যদি না থাকিতেন তবে জগৎ থাকিত না। সুতরাং চূড়ান্ত পারমার্থিক ভাবে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। তবে যে, জগৎ দৃষ্ট হইতেছে উহা কেবল ব্রহ্ম-সত্তার আশ্রয়ে। যেমন সত্য রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান ভ্রমে আরোপিত হয়—সেইরূপ সত্য বস্তু যে পরমাত্মা তাঁহাতে, এই জগতের সত্তা উপলব্ধি হইতেছে। ফলতঃ যেমন "রজ্জু কখনই সর্প নহে" তদ্রূপ ব্রহ্ম কখনই জগৎ নহেন। আর রজ্জুর অভাবে যেমন ঐরূপ সর্প উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ, ব্রহ্ম না থাকিলে এ জগৎ দৃষ্টই হইত না। এই প্রকার বস্তুরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যেতে অবস্তুর আরোপ-রূপ অধ্যারোপ-ন্যায় সামান্যতঃ দর্শিত হইয়াছে। তাহার পর উক্ত গ্রন্থে জীব-চৈতন্যেতে বিশেষ অধ্যারোপ দর্শাইয়াছেন। যথা স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আনন্দময় কোষাবচ্ছিন্ন জীব, ইত্যাদি আত্মা নহে। উহাদের ধর্ম্ম জীব-চৈতন্যেতে অধ্যারোপিত হইয়া থাকে মাত্র। অতএব ব্রহ্মই আত্মা।

১০৯। "অপবাদ-ন্যায়" অধ্যারোপ-ন্যায়ের বিপরীত ক্রম। "অধ্যারোপ-ন্যায়" দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ক্রম পূর্ব্বক জগতের সত্যতা প্রকাশ হওয়া ব্যাখ্যাত হয়, আর "অপবাদ-ন্যায়" দ্বারা সমুদয় সৃষ্টিকে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্ম-মূলে লয় করিয়া কেবল ব্রহ্মকে মাত্র দৃষ্ট করার উপদেশ প্রদত্ত হয়। অর্থাৎ যদি সৃষ্টির উৎপত্তির ক্রম মনে কর, তবে দেখিবে কেবল ব্রহ্মই আদিতে ছিলেন আর কিছু ছিল না; আর যদি প্রলয় চিন্তা কর, তাহাতেও দেখিবে যে, সকল মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই সত্য। কেবল কিছু দিন তাঁহার আশ্রয়ে এই সব সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

১১০। ব্রহ্মই বস্তু। সমুদয় জগৎ তাঁহার তুলনায় অবস্তু। এইরূপ তাৎপর্য্যে জগৎ মিথ্যা। সমস্ত জগতে যিনি জগতের সহিত অপৃথক্ রূপে বৈশ্বানর ও বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস, ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ, এই সকল নামে উপহিত তিনিই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের বাচ্য এবং বিবিক্ত অর্থাৎ অসম্পৃক্ত বা পৃথক্ রূপে ঐ মহাবাক্যের লক্ষ্য হয়েন। যেমন দগ্ধ-লৌহ-পিণ্ডের সহিত অভিন্ন অগ্নি "অয়োদহতি" এই বাক্যের বাচ্য এবং লৌহ-পিণ্ড হইতে ভিন্নরূপে তাহার লক্ষ্য হয়।* শ্রীমান্ সদানন্দ যোগীন্দ্রের এই বিবরণের তাৎপর্য্য এই যে, লৌহ যখন অগ্নি-সম্পৃক্ত হয় তখন অগ্নি আর লৌহ যেন এক হইয়া যায়। সেই লৌহ-সংযোগে কোন দ্রব্য যদি দগ্ধ হয়, তবে লোকে বলে "অয়োদহতি" অর্থাৎ লোহায় দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ বাক্যের বাচ্যই অভিন্ন অগ্নি। অর্থাৎ লোহাতে যে অগ্নি সম্পৃক্ত হইয়া আছে তাহা। ফলে সে অগ্নি লোহা হইয়া যায় নাই। সুতরাং "সে অগ্নি পৃথক্" ঐ বাক্যের এইরূপ লক্ষ্য হয়। তদ্রূপ পরমেশ্বর সমস্ত জগতে ওতপ্রোত। জগৎ আর তিনি যেন এক। সেই জন্য বলা যায় যে, "সবই ব্রহ্ম"। কিন্তু এরূপ কথার লক্ষ্য এই যে, ব্রহ্ম জগৎ হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু জগৎ নহেন। এইরূপ তাৎপর্য্যে জগৎ মিথ্যা ব্রহ্মই সত্য, এই রূপ তাৎপর্য্যে ব্রহ্মও সত্য জগৎও সত্য এবং এইরূপ তাৎপর্য্যেই জগৎ কেবল উপাধি মাত্র, কিন্তু ব্রহ্মই লৌহ-সম্পৃক্ত অগ্নির ন্যায়, লক্ষণা-প্রয়োগে, জগৎ-শব্দের বাচ্য। এই প্রকারের তাৎপর্য্য সমূহের জ্ঞাপনার্থে অধ্যাস, আরোপ, অধ্যারোপ-ন্যায়, অপবাদ-ন্যায় প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার হয়।

আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি।

১১১। বেদান্তসারে আছে যে, পরমেশ্বরের সৃষ্টি-শক্তি যে অজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি তাহা সত্তাদি-গুণযুক্ত এবং ভাব-রূপা। তাহারই গুণবিক্ষেপে এই জগৎ হইয়াছে। অজ্ঞানের সেই শক্তির নাম বিক্ষেপ। আর জগতে বিক্ষিপ্ত ঐ অজ্ঞান আমাদিগকে মোহিত করিয়া রাখায়, আমরা তাহার নিয়োজয়িতা পরমেশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান পাই না। উহা যেন পরমেশ্বর ও আমাদের মধ্য-পথে আবরণ-স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। এই কারণে উহার আবরণ-শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতির এই আবরণ-শক্তির দ্বারা আমাদের নিকট পরমাত্মা আচ্ছন্ন হইয়া আছেন এবং উহার বিক্ষেপ-শক্তির মধ্যেও আমরা তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান পাই না। পঞ্চদশী কহেন "যেমন শুক্তিকাতে রজতের অধ্যাস হয়, তদ্রূপ অবিদ্যার আবরণ-শক্তির দ্বারা আবৃত কূটস্থ চৈতন্যেতে, (অবিদ্যার) যে শক্তি দ্বারা স্থূল-শরীর ও লিঙ্গ-শরীরের সহিত জীব-চৈতন্যের অধ্যাস সম্পাদিত হয়, তাহাকে বিক্ষেপ-শক্তি বলা যায় এবং ঐ অধ্যাসের নাম বিক্ষেপাধ্যাস"।* জীব-চৈতন্য ও কূটস্থ-চৈতন্যের মধ্যে পরস্পর বিভিন্নতাও আছে সাদৃশ্যও আছে। এই জন্য কূটস্থ চৈতন্যে জীবের আরোপ হয়।† অর্থাৎ জীব কেবল অহংকার-বাচক। পরমাত্মা কর্তৃক সৃষ্ট না হইলে থাকিত না। সুতরাং তাহা সে ভাবে অসত্য ও অবস্তু। পরমাত্মাই বস্তু ও সত্য। তিনিই যথার্থ আত্মা। তাঁহার তুলনায় জীব অনাত্মা। বিক্ষেপ দ্বারা ঐ অনাত্মা জীব

* ৬।৩৩। † ৬।৩৮।

সেই আত্মাস্বরূপ পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া সত্য-জীবাত্মারূপে প্রকাশ পায়। "ভ্রমস্থলে শুক্তিকাদিতে আরোপিত যে জ্ঞান তাহারই নাম যেমন রজত বলা যায়, তদ্রূপ কূটস্থ চৈতন্যেতে (জীবের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যবশতঃ) বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা অধ্যস্ত যে (আত্ম) জ্ঞান তাহাকেই জীব বলা যায়।"* কূটস্থ চৈতন্যের স্বয়ং-অংশ ও বস্তু-অংশেতেই কেবল জীবের সাদৃশ্য।† সুতরাং কেবল সেই দুই অংশেই জীবের আত্মত্ব অধ্যাস হইয়া থাকে। অতএব জীবাত্মা স্বীয় অহংকারাংশে স্বয়ংও বস্তুস্বরূপ;‡ কিন্তু আত্মা-অংশে মিথ্যা ও অবস্তু স্বরূপ। ফলে অধ্যাস দ্বারা কূটস্থ-ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে সেই অংশ পূর্ণ করিয়া লয়। তখন জীব সেই পরমাত্মাকে লইয়া আত্মা হয়।¶ কিন্তু অবিদ্যা-জনিত বিক্ষেপাধ্যাস-প্রভাবে জীব জানিতে পারে না § যে, রজতস্বরূপ পরমাত্ম-জ্ঞানকে আমি আপন শুক্তিস্বরূপ জীবত্বে আরোপ করত ব্যবহার করিতেছি। সে আপনার অহংকার জন্য মনে করে আমিই "আত্মা"। ফলে যখন সাধনা দ্বারা অবিদ্যার আবরণ-শক্তি দূর হয় ও তদীয় বিক্ষেপ-জনিত অধ্যাস বিগত হয়, আর সেই প্রকৃত রজতের প্রতি তাহার জ্ঞান-নেত্র প্রসারিত হয়, তখন সে আর আপনার মিথ্যা জীবত্বে মুগ্ধ না হইয়া, জ্ঞানযোগে পরমাত্মাতেই সম্পূর্ণ মমতা-বুদ্ধি স্থাপন করে। অতএব এইরূপে জীব-চৈতন্যের অবিদ্যা-কল্পিত স্বরূপ নিরূপণ করিয়া কাম-কর্ম্ম-বীজ-স্বরূপিণী মায়া ত্যাগ পূর্ব্বক, ব্রহ্মাত্মভাব লাভ করিবে। "যেমন পটেতে পুত্তলিকাদি চিত্রিত হয়,

---

* ৬।৩৬। † ৬।৩৪। ‡ "বস্তুস্বরূপ" অর্থ "সত্য"।
¶ ৬।৫০। § ৬।৫২।

তদ্রূপ বিচিত্র এই দ্বৈত-জগৎ সমুদায় (পরমেশ্বরের সৃষ্টি-শক্তি-স্বরূপিণী) মায়া দ্বারা (তাঁহার) স্বীয় পরমাত্ম-চৈতন্যে অধ্যারোপিত হইয়াছে। তাহাকে (মায়াকে) অনাদর পূর্ব্বক (সেই) চৈতন্যকে নির্ব্বিশেষ করা কর্ত্তব্য।"*

ঈশ্বর-চৈতন্য।

১৯২। জগৎ-রচনার কর্ত্তৃত্ব উপলক্ষে পরমেশ্বরের "ঈশ্বর-চৈতন্য" নাম হয়। মায়া ঐ কর্ত্তৃত্বের সহযোগী। ফলে মায়া তাঁহারই সৃষ্টি-শক্তি; সুতরাং তাহার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নাই। বিবিধ কর্ত্তৃত্ব উপলক্ষে এই ঈশ্বর-চৈতন্যের বিবিধ সংজ্ঞা হয়। তন্মধ্যে বেদান্তদর্শন কেবল জীবের নিয়ন্তৃত্ব উপলক্ষ করিয়া তাঁহার তিনটি নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। জীবের ত্রিবিধ দেহ। কারণ, সূক্ষ্ম, ও স্থূল। সমুদয় জীবের ঐ তিন প্রকার দেহের রচনা, অন্তর্যামিত্ব ও বিধাতৃত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ঐ সকল সংজ্ঞা। যথা কারণ-দেহে তিনি ঈশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, অন্তর্যামী, জগৎকারণ, অব্যক্ত ইত্যাদি। সূক্ষ্মদেহে তিনি হিরণ্যগর্ভ। স্থূলদেহে তিনি বিরাট বা বৈশ্বানর। পরমেশ্বর বাক্য মনের অগোচর; তথাপি সৃষ্টি-কার্য্যের উপলক্ষে পূর্ব্বতন ঋষিরা তাঁহার এইরূপ নানা সংজ্ঞা ও ক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্ত যথার্থ-জ্ঞান-প্রদান-উদ্দেশে ইহাই জ্ঞাপন করিতেছেন যে, পরমেশ্বরের ঐ সমস্ত সংজ্ঞাই মায়াতে কল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টিক্রিয়ার সংশ্রবে কল্পনা করা গিয়াছে†।

---

* পঃ দঃ ৬।২৮৯। † আমার সৃষ্টিগ্রন্থে 'অব্যক্ত প্রং' দেখহ।

জীব-চৈতন্য।

১১৩। বেদান্ত যে ভাবের ভাবুক হইয়া পরমেশ্বরকে কার্য্যরূপ কহিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অবিদ্যাই ঐ কার্য্যের উপাদান স্বরূপ। অবিদ্যা, মায়ার ন্যায়, কর্ত্তারূপী ঈশ্বরের বশীভূত হইলেও কার্য্যরূপ ঈশ্বরের বশীভূত নহে। বরং সেই কার্য্যরূপ ঈশ্বর অবিদ্যারই বশতাপন্ন। ইহার কারণ এই যে, তিনি যখন কার্য্য হইলেন তখন আর তাঁহার ক্ষমতা কি? সামান্যতঃ যদিও পরমেশ্বর এইরূপে সর্ব্বজগৎ-স্বরূপ, এবং তদুপলক্ষে সমস্ত নাম রূপ তাঁহাতেই প্রয়োগ হইতে পারে, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র লক্ষণা দ্বারা তাঁহার জীবরূপ কার্য্যত্ব উপলক্ষ করিয়া তাঁহার তিনটি নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা প্রত্যেক জীবের কারণ-দেহে তিনি প্রাজ্ঞ, সূক্ষ্মদেহে তৈজস এবং স্থূলদেহে বিশ্ব। এই চৈতন্যত্রয়ই জীব-শব্দের বাচ্য *। ইনিই ভোক্তা, কর্ত্তা এবং প্রাণের ধারয়িতা। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অল্পজ্ঞ। ইনিই লোকলোকান্তর গমন করেন—পাপপুণ্যের ফলভোগী। যদিও এই ত্রিবিধ চৈতন্য সামান্যতঃ জীব-শব্দের বাচ্য কিন্তু কূটস্থ-ব্রহ্ম-চৈতন্যের আলোক ব্যতীত ইনি এক মুহূর্ত্তও স্বয়ং প্রকাশিত হইতে বা অন্য কোন পদার্থকে প্রকাশ করিতে পারেন না। ইনি তাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া, স্বকীয় মানসিক অহংকারকে ভ্রমে আত্মা বলিয়া বোধ করেন। সেই ভ্রম ভাঙ্গিলে সেই কূটস্থ পরমাত্মাতেই আত্মদৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঐ ভ্রমের নাম অধ্যাস তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

---

* এস্থানে ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্বে জীব-ধর্ম্মের অধ্যাস হইয়াছে। ব্যবহারিক জীব উহা আছে, তাহা ক্রমে জানা যাইবে।

তুরীয়-ব্রহ্ম-চৈতন্য।

১১৪। ব্রহ্ম এই সৃষ্টির উপাদান অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করেন নাই। সকলি তাঁহার সৃষ্টি-শক্তির কার্য্য। কিন্তু সে সৃষ্টি-শক্তি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। সৃষ্টির উপাদানের অন্য উৎপত্তি-স্থানের অভাবে তাঁহার সেই শক্তিই মূল উপাদানস্বরূপ। সুতরাং শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনিই সমুদয় জগতের স্বরূপ।—এটিকে কেবল লক্ষণা-প্রয়োগ বলিয়া জানা উচিত। মাণ্ডুক্যোপনিষদে আছে। "সর্ব্বংহ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মাব্রহ্মসোয়মাত্মাচতুষ্পাৎ।" এই জগতের সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই আত্মা চতুষ্পাৎ।

১১৫। ঐ আত্মার তিন পাদ সৃষ্টিতে, অবশিষ্ট পাদ সৃষ্টির অতীত।* প্রাগুক্ত তিন পাদ কারণ ও কার্য্য উভয়-রূপী। কারণ রূপে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বৈশ্বানর। কার্য্য-রূপে প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব।

১১৬। এই কারণ এবং কার্য্যরূপী ষড়্‌বিধ চৈতন্যের সহিত সৃষ্টিতে অনুপহিত পাদস্বরূপ আধার ব্রহ্ম-চৈতন্যের ভেদ নাহি। তিনিই মূলাধার, সকলের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মায়া ও অবিদ্যা উপহিত পাদত্রয়ে বিভক্ত চৈতন্যদিগের ভাব অতিক্রম না করিলে সেই চতুর্থ পাদস্বরূপ আধার চৈতন্যে আরোহণ করা যায় না। ফলে সেই চতুর্থ পাদের ভাব জগৎ-সংসারে ব্যক্ত নাহি। তাহা অবিদ্যাতে

---

* স্থানান্তরে এই অবশিষ্ট পাদের অসীমতা জন্য তাহাকে তিন পাদ এবং সৃষ্টির অন্তর্গত তিন পাদের অল্পতা জন্য তাহাকে এক পাদ বলিয়াছেন। আমার সৃষ্টিগ্রন্থ ১১২ ক্রম দেখহ।

বর্ত্তমান নাহি, মায়াতে বর্ত্তমান নাহি। কিন্তু সৃষ্টি-শক্তির অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত। মাণ্ডুক্য উপনিষদে জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এই ত্রিবিধ শরীর ও জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থার বিবরণ করিয়া অবশেষে কহিয়াছেন "অদৃষ্ট-মব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমব্যপমেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং। প্র-পঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।" যে অবস্থা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়, তাহাই চতুর্থ বলিয়া জানি, তিনিই আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়। "চতুর্থং তুরীয়ং মন্যতে।" জগদ্ব্যাপারি-বর্জ্জিত আত্মার এই চতুর্থ পাদকে তুরীয় বলে। তিনিই আত্মা, তাঁহাকেই আত্মপ্রত্যয়ে জানিবে। প্রত্যয় বিনা তাঁহাকে জানার অন্য উপায় নাই।

কূটস্থ-চৈতন্য ও আভাস-চৈতন্য।

১১৭। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে মায়াতে উপহিত কারণ-রূপী ব্রহ্ম-চৈতন্যই ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট নামে সৃষ্টি-কর্ত্তা; এবং অবিদ্যাতে উপহিত কার্য্যরূপী চৈতন্য প্রাজ্ঞ, তৈজস, ও বিশ্ব-নামক জীব-বাচক। যদিও ঐ ঈশ্বরকেই অন্তর্যামিত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হওয়াতে সকল আশঙ্কাই নিবারিত হইতে পারে, তথাপি পঞ্চদশী মায়ার অতীত নিরুপাধিক ব্রহ্ম-চৈতন্যের বিশেষ জ্ঞান লাভের নিমিত্তে তাঁহার আর দুই প্রকার বর্ত্তমানতা দর্শাইয়াছেন। তাহার এক প্রকার কূটস্থ-

চৈতন্য। অন্য প্রকার আভাস-চৈতন্য। কূটস্থ-চৈতন্যের নামান্তর সাক্ষী-চৈতন্য।*

১১৮। পঞ্চদশীতে নিম্নোল্লিখিত দৃষ্টান্তটি আছে। বোধ হয় তদ্দ্বারা কূটস্থ-চৈতন্যের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে।—

১১৯। অহংকারের অভিমানী জীব কর্ত্তা। মন তাঁহার করণ।† মনের দুই বৃত্তি। অহং এবং ইদং। অহং বৃত্তি দ্বারা জীব আপনার কর্ত্তৃত্ব এবং ইদং বৃত্তির দ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান পায়। এই কর্ত্তা জীব, মনোবৃত্তি ক্রিয়া, এবং বাহ্য বস্তু এ সমুদয় এক কালে সর্ব্ব-প্রকাশক ব্রহ্ম-চৈতন্য-জ্যোতিতে (সত্তারূপে) প্রকাশিত হয়। তাঁহার সেই প্রকাশক অংশ সৃষ্টি-রচনায় লিপ্ত নহে। এবং জীবের কামনাকে নিয়মিত করা যাহা তাঁহার অন্তর্যামিত্বের কার্য্য, তাহাতেও প্রবৃত্ত নহে। সেই কূটস্থ অংশ কেবলই প্রকাশক। সে ভাবে তাঁহাকে সাক্ষী-চৈতন্য-স্বরূপ পরমাত্মা বলা যায়। "যেমন নৃত্য-শালাস্থিত দীপজ্যোতিঃ গৃহস্বামী ও সভ্যগণ এবং নর্ত্তকী এ সকলকেই সমানভাবে এক কালে প্রকাশ করে এবং তাহা-দিগের অভাবেও স্বয়ং প্রদীপ্ত থাকে তদ্রূপ দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শ এ সমুদয় আর অহংকার, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিষয় সকল ইহাদের সত্তা সাক্ষী-চৈতন্য-জ্যোতিতে এক কালে সমান ভাবে প্রকাশিত হয় এবং তাহাদের অভাবেও (কূটস্থ-চৈতন্য) স্বয়ং পূর্ব্ববৎ দীপ্যমান থাকেন।"‡ মানব মনোবুদ্ধি দ্বারা যে কিছু কল্পনা করেন পরব্রহ্ম সে সমুদয়কে

---

* পঃ দঃ ৮।২৪ ও ৮।৫৫।

† যাহার দ্বারা কার্য্য করা যায় তাহার নাম "করণ"।

‡ ১০। (১০—১২)।

প্রকাশ করতঃ তাহাদিগের সাক্ষী হয়েন।* কিন্তু তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার ও স্বয়ম্প্রকাশ। তিনি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার বিষয়কে প্রকাশ করেন, কিন্তু বুদ্ধি তাঁহাকে জানিতে পারে না।†

১২০। জীব-চৈতন্যেতে স্বভাবতঃ যে জ্যোতিঃ আছে তাহা কূটস্থ-চৈতন্যের প্রকাশিত পদার্থ সমূহের উপরি যখন বুদ্ধিকর্ত্তৃক প্রেরিত হয় তখন সেই সকল পদার্থ দ্বিগুণ আলোক লাভ করে। কেন না তৎসমূহ জীবের অজ্ঞাতসারে সামান্যতঃ কূটস্থ-চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত আছেই, তদুপরি জীব যখন তাহাদের জ্ঞান লাভ ইচ্ছা করিয়া, আপনার অন্তর্জ্যোতিঃ প্রক্ষেপ করে, তখন উক্ত পদার্থ সকল দ্বিগুণ-প্রকাশ-বশতঃ জীব কর্ত্তৃক জ্ঞাত হয় ‡। জীব স্বীয় অন্তর্জ্যোতিঃ প্রক্ষেপ না করিলে যদিও কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, কিন্তু কূটস্থ-চৈতন্য দ্বারা পদার্থ সকল জীবের অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়া না থাকিলে তাহার জ্ঞানলাভে জীবের অন্তর্জ্যোতিঃ কোন রূপে ক্ষমবান্ হইত না ¶। আবার জীবের সেই অন্তর্জ্যোতিও না থাকিলে জীবের বুদ্ধিতে কোন পদার্থ প্রকাশ পাইত না §। সেই অন্তর্জ্যোতির নাম "চিদাভাস" অথবা "আভাস-চৈতন্য"। এই আভাস-চৈতন্য কোন পদার্থে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে যেমন তাদৃশ পদার্থ কূটস্থ-ব্রহ্ম-চৈতন্য-জ্যোতিতে প্রকাশিত থাকে তদ্রূপ আভাস-চৈতন্য স্বয়ংও সেই কূটস্থ-চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়**। স্থূল

---

* ১০।২৩। † ১০।২৩। ৮।২০। ৮।৭১। ও ৮।৫৮।

‡ পঞ্চদশী ৮।১। ¶ ঐ ৮।৫।

§ ঐ ৮।৮। ** ঐ ৮।৩।

কথা এই যে, "আভস-চৈতন্য দ্বারা ঘটাদি বিষয়ের বিশেষ প্রত্যক্ষ হয় আর কূটস্থ ব্রহ্ম-চৈতন্য দ্বারা তাহার সামান্য জ্ঞান মাত্র হয়" *। জীবের "অহংঙ্কার বৃত্তি ও কাম ক্রোধাদি বৃত্তিতে আভাস-চৈতন্য মিশ্রিত হইয়া ব্যাপ্ত আছেন"† তদতিরিক্ত কূটস্থ-চৈতন্য দ্বারা, তৎসমূহ সামান্যতঃ প্রকাশমান থাকে। সুতরাং অন্তঃকরণস্থ বৃত্তি সমুদায়েতেও চৈতন্য-জ্যোতির দ্বৈগুণ্য স্বীকার করা যায়। কিন্তু অন্তঃকরণস্থ বৃত্তি-সমূহে সন্ধিস্থান থাকাতে বাহ্য বিষয় অপেক্ষাও তাহাতে প্রকাশের আধিক্য হইয়া থাকে ‡। অর্থাৎ জীব-চৈতন্যের স্বকীয় অন্তর্জ্যোতি স্বরূপ যে আভাস-চৈতন্য ও তত্রস্থ কূটস্থ-চৈতন্য-জ্যোতিঃ এই উভয় চৈতন্য-জ্যোতিতে অন্তঃকরণ যাদৃশ বিশদরূপে প্রকাশিত হয়, বাহিরের পদার্থ সকল সেরূপ হয় না।

১২১। সৃষ্টিক্রিয়া ও কামনার বিধাতৃত্ব স্বরূপ অন্তর্যামিত্ব সম্বন্ধে পরমেশ্বরের নাম ঈশ্বর-চৈতন্য হয়। সর্ব্বত্র প্রকাশক রূপে এবং সর্ব্বসাক্ষিত্ব বিধায় তাঁহাকে কূটস্থ-চৈতন্য বলা যায়। সৃষ্টি-সংসারের অতীতরূপে তাঁহাকে তুরীয় কহে। কিন্তু জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং মুক্তি এই সকল জীব-চৈতন্যের অবস্থা। তাঁহারই অন্তর্জ্যোতির নাম আভাস-চৈতন্য।

১২২। জীবের যে বিশুদ্ধ ও বীজভাব তাহাই ভোক্তা। আভাস-চৈতন্য ব্রহ্ম-জ্যোতির প্রতিবিম্ব মাত্র¶ তথাপি লোকে আভাস ও কূটস্থ চৈতন্যের একীভাবেতে অধ্যাস দ্বারা অহং-

* ঐ ৮।১৫। † ঐ ৮।১৭। ‡ পঃ দঃ ৮।২১।

¶ পঃ দঃ ৭।১৯৫। এই সন্ধিস্থানই সাদৃশ্য। ১৪৬ (ক) ক্রম দেখহ। অপিচ সৃষ্টিগ্রন্থে ৭৮ ক্রম দেখহ।

শব্দের প্রয়োগ করত * তাঁহাদের প্রতি জীবের ভোক্তৃত্ব আরোপ করিয়া থাকে। † কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জীবই ভোক্তা এবং আভাস-চৈতন্য জীবের অন্তর্জ্যোতি মাত্র। তাহা জীবের নিজ সৃষ্ট নহে কিন্তু ঐ কূটস্থ চৈতন্যের জ্যোতি স্বরূপ জীবের বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। অতএব কূটস্থ-চৈতন্যের সত্তাতেই আভাস-চৈতন্যের সত্তা।

১২৩। যেমন নেত্র বাহ্য জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া একটী জ্যোতিঃ লাভ করে, সেই জ্যোতিঃ দ্বারা আবার বাহ্য পদার্থের অবয়ব দৃষ্টি করে, কিন্তু সেই অবয়ব যদি বাহ্য জ্যোতিতে প্রকাশিত না থাকিত, তবে নেত্রের ঐ জ্যোতিঃ ঐ অবয়বকে প্রকাশ করিতে পারিত না। যেমন একই বাহ্য জ্যোতিঃ সর্ব্বপদার্থকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে এবং নেত্রেরও জ্যোতিঃ হইয়াছে, সেইরূপ কূটস্থ-চৈতন্য-জ্যোতিঃ পদার্থ মাত্রের সত্তা ও স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। জীবাত্মা সেই জ্যোতিঃ লাভ করিয়া আপনি প্রকাশিত হইতেছে। সেই জ্যোতিই জীবের অন্তর্জ্যোতিঃ বা আভাস-চৈতন্য। তাহারই দ্বারা জীব স্বীয় অধিকার অনুযায়ী কূটস্থ-ব্রহ্ম-চৈতন্য-প্রকাশিত জ্ঞানযোগ্য পদার্থের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।

১২৪। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যদি কূটস্থ চৈতন্য-জ্যোতিই জীবের অন্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া আভাস-চৈতন্য বা অন্তর্জ্যোতিঃ রূপে পরিণত হয়, তবে, জীবের কি আপনার কোন জ্যোতিঃ নাই? এ কথার উত্তর এই যে, সূর্য্যের জ্যোতিঃ হইতে লব্ধ জ্যোতিঃ ভিন্ন নেত্রের স্বকীয় কি কোন জ্যোতিঃ নাই? অবশ্য

---

* পঃ দঃ ৭। ১০। † ঐ ৭। ১৯৬।

আছে। কিন্তু তাহা জ্যোতিঃ গ্রহণের এক অধিকার মাত্র। বাহ্য-জ্যোতির অভাবে তাহা অন্ধকার। তদ্রূপ জীবের স্বীয় জ্যোতিও পদার্থজ্ঞান লাভার্থ এক অন্ধ অধিকার মাত্র। কূটস্থ চৈতন্য সেই অধিকারটি পূর্ণ করিয়া জীবের অন্তর্জ্যোতিঃ, "চিদাভাস," বা "আভাস-চৈতন্য" রূপে পরিণত হয়।—যেমন নেত্রই বাহ্যজ্যোতিঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া অপর অবয়ব দৃষ্টি করে, কিন্তু ঘট তদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াও তাহা পারে না, সেইরূপ যখন জীবেতেই কূটস্থ চৈতন্য জীবের অন্তর্জ্যোতিঃ বা আভাস-চৈতন্য রূপে প্রতিফলিত হয়েন—কিন্তু জড়পদার্থে তদ্রূপ হয়েন না, তখন, জীবের যে একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত অধিকার আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব আভাস-চৈতন্য জীব নহেন কেবল কূটস্থ ব্রহ্ম-চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু সামানাধি-করণ্য বশতঃ লক্ষণা দ্বারা জীবের সহিত অভেদ-রূপে কথিত হইয়া থাকেন।* এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমাদের হৃদয়ের সেই সরস ভাবটি সিদ্ধ হইতেছে—যাহার ভাবুক হইয়া আমরা পরমেশ্বরকে বলিয়া থাকি "তুমি আমাদের অন্তরের আলোক"।

---

* এই রূপ অভেদ-লক্ষণায় যদি এমত আশঙ্কা হয় যে, বাস্তবিক ব্রহ্ম-চৈতন্যই বুঝি জীবরূপে পরিণত হইয়া থাকেন এই হেতু বেদান্তশাস্ত্রে নানা স্থানে কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম সর্ব্ব ঘটে প্রবেশ করিয়াও কাহারও দোষ গুণে লিপ্ত নহেন। কঠোপনিষদে, ৫ ব। ১১ শ্লো, আছে "সূর্য্যোযথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।" সর্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেমন চাক্ষুষ বাহ্য দোষে লিপ্ত হন না, সেইরূপ একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, আপনা হইতে ভিন্ন লোক-দুঃখে লিপ্ত হন না। উদ্দেশ্য এই যে, "লোকে দেহাত্মজ্ঞানেতে যে প্রকার সন্দেহ বা বিপর্য্যয় রহিত হয় তদ্রূপ কূটস্থাত্ম-জ্ঞানেতেও অসন্দিগ্ধ বা অবিপর্য্যস্ত হইয়া বিবেচনা করিবেক।" পঃ দঃ ৭। ১৯।

মহাবাক্য।

১২৫। উপনিষদে জীব-ব্রহ্ম বা জগৎ-ব্রহ্ম প্রতিপাদক কতিপয় সংক্ষেপ উক্তি আছে। যথা "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম," "অহং-ব্রহ্মাস্মি," "তত্ত্বমসি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "একমেবাদ্বিতীয়ম্," "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" ইত্যাদি। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা স্ব স্ব বৈদান্তিক গ্রন্থে তাহারই ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মাত্মজ্ঞান এবং জগদাত্মজ্ঞান প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ সমুদয় উক্তি এইক্ষণে সামান্যতঃ মহাবাক্য-নামে গণ্য হইয়া থাকে।

১২৬। পঞ্চদশীর মহাবাক্য-বিবেকে প্রথমোক্ত চারিটি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য আছে।

১২৭। "প্রজ্ঞানংব্রহ্ম" এই উক্তিটি ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণান্তর্গত ঐতরেয় উপনিষদের শেষাংশে আছে। তথা উহার প্রয়োগ এইরূপ। যথা—প্রজ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর দ্বারা সকল ভূত সত্তা লাভ করিয়াছে, প্রজ্ঞানই সকলের মূল। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। বামদেব প্রজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে জানিয়া স্বর্গ-লোকে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মাই, জীবত্মার প্রজ্ঞা-নেত্র *। সেই পরমাত্মার জ্ঞানরূপ সত্তাতে জীবাত্মার জ্ঞানরূপ সত্তা। অতএব পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভেদ জ্ঞান করাই অমৃতত্ব লাভের হেতু। এ সম্বন্ধে পঞ্চদশী কহেন যে,"যে চৈতন্য-জ্যোতিঃ দ্বারা দৃশ্য পদার্থ সকল দর্শন হয় এবং যাঁহার দ্বারা শব্দের শ্রবণ, গন্ধের ঘ্রাণ, বাক্য-কথন এবং সুস্বাদ ও বিস্বাদ সকল অবগত হওয়া যায় সেই

---

* প্রজ্ঞানেত্রং যস্য তদিদং "প্রজ্ঞানেত্রং" ইতি শঙ্কর। ঐতঃ উপঃ।

বুদ্ধিস্থ জীব-চৈতন্য* 'প্রজ্ঞান' শব্দের বাচ্য হয়েন।" সকলেতেই পরব্রহ্ম অবস্থান করেন, সুতরাং আমাতেও তিনি প্রজ্ঞানরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব একাধার-স্থিত প্রজ্ঞান-চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য একই।

১২৭(ক)। "অহং ব্রহ্মাস্মি।" এই মহাবাক্যটি যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে। পঞ্চদশীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "পরমাত্মা * * * (জীবের) অন্তকরণের সাক্ষীরূপে প্রকাশমান হইয়া অবস্থিতি করতঃ অহংশব্দের বাচ্য হয়েন," অহং শব্দের বাচ্য (সাক্ষী) চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য একই।

১২৮। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ড হইতে, পঞ্চদশ খণ্ড পর্য্যন্ত বহু বার উদ্দালক কর্ত্তৃক তৎপুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি উপদেশ ছলে উক্ত হইয়াছে। উদ্দালক কহিয়াছেন হে শ্বেতকেতো! ব্রহ্মই বিশ্বের জীবন, এবং সর্ব্বাত্মা। হে শ্বেতকেতো! (তিনিই তোমার আত্মা) তুমি তিনিই। পূর্ব্বে কেবল একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, এইক্ষণেও আছেন, তিনিই "তৎ" শব্দের বাচ্য। প্রাণীসকলের অন্তঃকরণস্থিত যে চৈতন্য তিনি "ত্বং" পদের বাচ্য। ঐ উভয় চৈতন্য একই।

১২৯। মহাবাক্য নামে যতগুলি পদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে "তত্ত্বমসি" বাক্যই বিখ্যাত। সুতরাং তাহার তাৎপর্য্য পরিষ্কাররূপে দেওয়া উচিত। তুরীয় ব্রহ্ম-চৈতন্যকে "তৎ" শব্দে কহা যায়। "তৎ" শব্দ ব্যাকরণের তৃতীয় পুরুষ এবং

---

* এস্থানে "বুদ্ধিস্থ-জীব-চৈতন্য" শব্দে প্রজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মই, যিনি জীবের বুদ্ধিতে চৈতন্য সম্পাদন করেন।

সর্ব্বনাম। উহার অর্থ "সেই" কি না যাহা অপ্রত্যক্ষ। অর্থাৎ সেই পরমাত্মা। কোন্ পরমাত্মা? না যিনি জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের কারণ, অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে যাঁহার বিবরণ বলা হইয়াছে। আর ঐ পরমাত্মা যে বিশেষ ভাবে তোমার অন্তরাত্মা হইয়াছেন তাঁহাকেই সংস্কৃতে "ত্বং" শব্দে কহা যায়। "ত্বং" শব্দের অর্থ তুমি। ইহা দ্বিতীয় পুরুষ ও সর্ব্বনাম। ঐ পূর্ব্বোক্ত "তৎ" ও শেষোক্ত "ত্বং" এই দুই পদ "অসি" ক্রিয়ার যোগে কর্ম্মধারয় সমাসে "তত্ত্বমসি" বাক্য হয়। উহার অর্থ এই যে, "সেই পরমাত্মা তুমি হও" অর্থাৎ তোমার তুমিত্ব যে ব্রহ্ম, তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গের কারণ। এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মকেই বিশেষ করিয়া দর্শন করা হইয়াছে, আর অল্পজ্ঞ যে নামমাত্র জীবাত্মা তাহাকে কথায় ত্যাগ করত কার্য্যতঃ ঐ যোগেই বদ্ধ করা হইয়াছে; কারণ তাহাই যোগানন্দের ভোক্তা। * ভগবান্ যিষুখৃষ্টও কহিয়াছিলেন "আমি এবং আমার পিতা এক"। নানা সম্প্রদায়ের খৃষ্টানেরা ঐ বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেন। দেবত্রয়বাদী খৃষ্টানগণ বলেন যে, প্রভু যিশুখৃষ্ট ঈশ্বরেরই অবতার এই জন্য ঐরূপ বলিবার তাঁহার অধিকার ছিল। একেশ্বরবাদী খৃষ্টানগণ কহেন যে "উহার অর্থ—আমি এবং আমার পিতা এক অভিপ্রায়বিশিষ্ট—অর্থাৎ তাঁহারও যে অভিপ্রায় আমারও সেই।" কিন্তু উহার অর্থ অদ্বৈত-পক্ষেই সংলগ্ন হয়। কেন না তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া য়িহুদীয়েরা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "তোমরাও

---

* ইহার সমাহার পরে পাওয়া যাইবে।

ঈশ্বরগণ”। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বল উহার অর্থ “তত্ত্বমসি” হইল কি না?

১৩০। উপরি উক্ত “তৎ” এবং “ত্বং” উভয় পদের শোধন ও সারগ্রহণ ব্যতীত উভয়ের ঐক্য হয় না। শোধন দ্বারা “তৎ” পদের যে সার ভাগ পাওয়া যায় এবং “ত্বং” পদের যে সার ভাগ পাওয়া যায় তাহাই পরস্পর এক হইবে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

১৩১। ইতিপূর্ব্বে অধ্যাস-প্রকরণে অধ্যারোপ ও অপবাদ-ন্যায় ব্যাখ্যা সময়ে বলিয়াছি যে, পরমেশ্বর সমস্ত জগতের সহিত অপৃথক্‌রূপেও বর্ত্তমান আবার সমস্ত জগৎ হইতে পৃথক্‌রূপেও বর্ত্তমান। তিনি জগৎ হইতে একেবারে পৃথক্ হইলেও চলে না এবং নিজে জগৎ হইয়া গেলেও চলে না। জগতের সহিত তাঁহার যে সেই অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ তাহা বুঝাইবার জন্য আচার্য্যেরা দগ্ধ-লৌহ-পিণ্ডকে দৃষ্টান্ত ধরেন। যখন দগ্ধ-লৌহ-পিণ্ড অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে তখন অগ্নি আর লৌহ যেন এক হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে লৌহও স্বতন্ত্র অগ্নিও স্বতন্ত্র। সেই ভাবে ব্রহ্মকে, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর নামে জগৎ-কারণ-রূপে এবং প্রাজ্ঞ, তৈজস, ও বিশ্ব নামে জগৎ-কার্য্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। উহা সমুদয় একই ব্রহ্ম-চৈতন্য। ঐ ব্রহ্ম-চৈতন্যের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ দুই আছে। কিন্তু সে ভেদাভেদ দগ্ধ-লৌহ-পিণ্ডবৎ। ঐ মিশ্রিত ভাব হইতে তাঁহাকে অগ্নিবৎ স্বতন্ত্র-রূপে লক্ষ্য করাই তাঁহার শোধন। এই সংশোধিত তুরীয়*

---

* সংশোধিত হইলে তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ হন, নচেৎ পাদত্রয়ের সৃষ্টির বিকারে লিপ্ত থাকেন।

ব্রহ্ম-চৈতন্যই "তৎ" শব্দে উক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্ম-চৈতন্যের এই ভাবটি অপ্রত্যক্ষ।

১৩২। অতঃপর জীব-চৈতন্যেরও শোধন আছে। যথা; মনুষ্য স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের সহিত এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, ও কর্ত্তাস্বরূপ জীবাত্মার সহিত মিশ্রিত থাকিয়া ভ্রমে সেই সকলকে, বা তাহাদের অন্যতরকে আত্মা বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহা ভ্রম। যেহেতু "প্রত্যগাত্মা স্থূল নহে, ইন্দ্রিয় নহে, প্রাণ নহে, কর্ত্তা (জীবাত্মা) নহে। চৈতন্যমাত্র সত্যস্বরূপ।"* পরমাত্মার অধিষ্ঠান-বিরহে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও জীব সমুদয়ই জড়। ঐ সমুদয় জড়ের ভাসক যে সত্যস্বরূপ চৈতন্য তিনিই আত্মা†—(তিনিই সকলের আত্মা—যেমন অন্যান্য জড়পদার্থের আত্মা, সেইরূপ তাঁহার বিরহে কর্ত্তাস্বরূপ জীবাত্মা যে জড়মাত্র, তাহারও তিনি আত্মা)। তিনিই প্রকৃত জীব-চৈতন্য। কিন্তু তিনি প্রাকৃতিক জীবাত্মা নহেন। তাহাতে দগ্ধ-লৌহস্থ অনলের ন্যায় উপহিত থাকেন এই মাত্র। সুতরাং তাঁহার প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্ব ইত্যাদি নামে স্বয়ং জীবরূপ-কার্য্য হওয়া জীবের সহিত ঐরূপ অভিন্ন বর্ত্তমানতা মাত্র। নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি স্বতন্ত্রই। কিন্তু তাঁহারই সত্তাতে, তাদৃশ জড়স্বরূপ জীব-চৈতন্যের দীপ্তি হয়। সুতরাং তিনিই জীবের প্রত্যক্ষ-চৈতন্য অথবা মুখ্য-জীবাত্মা। তাঁহাকে এইরূপে শোধিত জীব-চৈতন্য-স্বরূপে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করাই অভিপ্রায়। "ত্বং" শব্দ তাঁহাকেই প্রতিপাদন করে।

---

* বেঃ সাঃ ৩৩ পৃ। † ঐ ৩৪।

১৩৩। প্রাগুক্ত সংশোধিত অপ্রত্যক্ষ-চৈতন্য-স্বরূপ "তৎ" শব্দ এবং শেষোক্ত সংশোধিত প্রত্যক্ষ-চৈতন্য-স্বরূপ "ত্বং" শব্দ উভয়ই একমাত্র তুরীয়-ব্রহ্ম-চৈতন্যকে প্রতিপাদন করে।—এখন ঐ উভয় চৈতন্যের মধ্যে অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব মাত্র প্রভেদ থাকিতেছে। ফলে বেদান্তসার বলেন যে, ঐ উভয়ের মধ্যে এমন তিনটি সম্বন্ধ আছে যাহা বুঝিলে উভয়কে এক অখণ্ড ব্রহ্ম-চৈতন্য বলিয়া বোধ হয়।

১৩৪। সেই সম্বন্ধত্রয় যথা ; প্রথমতঃ সামানাধিকরণ্য* সম্বন্ধ অর্থাৎ "তৎ" ও "ত্বং" এ উভয় শব্দের এক মাত্র ব্রহ্মেতেই তাৎপর্য্য। ইহাতে এই হইল যে, যিনি অপ্রত্যক্ষ ছিলেন তিনি আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হইলেন।

দ্বিতীয়তঃ। বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্বন্ধ। যেমন "সেই দেবদত্ত এই" এস্থলে পূর্ব্বদৃষ্ট দেবদত্ত রূপ যে এক তাৎপর্য্য তাহাই বর্ত্তমান-দৃষ্ট দেবদত্তের বিশেষণ স্বরূপ। তদ্রূপ "ত্বং" পদ-বাচ্য প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-চৈতন্যই "তৎ" পদ-বাচক অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-চৈতন্যের সহিত এক হইল।

তৃতীয়তঃ। লক্ষ্যলক্ষণভাব সম্বন্ধ। "তৎ" এবং "ত্বং" উভয় পদই তাঁহার লক্ষণ। জগৎ-কারণতাতে তাঁহার যেমন আবির্ভাব, জগৎ-কার্য্যেতেও সেইরূপ। কারণ-রূপে তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ "তৎ"। কার্য্যরূপে তিনি তোমার তুমিত্ব অর্থাৎ "ত্বং"। এই "তৎ" এবং "ত্বং" পরমেশ্বরের কারণাধিষ্ঠানতা এবং কার্য্যাধিষ্ঠনতা রূপ লক্ষণ মাত্র। এবং উভয় লক্ষণদ্বারা তিনিই লক্ষ্য। যদি লক্ষণ-রূপ ভাগদ্বয় ত্যাগ করা যায়, তবে

* এক অধিকরণে স্থিতি বা এক স্থানে স্থিতি।

বিরুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে একমাত্র ব্রহ্ম-চৈতন্যই থাকেন। ইহাকে ভাগ-লক্ষণা বা ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণা কহে।

১৩৫। বেদান্তসারের ব্যাখ্যা স্বরূপে "তত্ত্বমসি" মহাব্যক্যের যে তাৎপর্য্য উপরে প্রদত্ত হইল তাহাই প্রকৃত অদ্বৈতবাদ। দ্বৈত-স্বরূপ জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্তা উহাতে ধ্বংস হয় নাই, প্রত্যুত আচার্য্যেরা সেই দ্বৈত-জীবাত্মাকে ব্রহ্মরূপ জীবনের দ্বারা জীবিত রাখিয়াছেন এবং ব্রহ্মকেই তাহার আত্মা বা জীবন বলিয়া দর্শাইয়াছেন। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় শারীরক-ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, "হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি, এই শ্রুতিতে প্রকৃত সৎকে আত্মশব্দে উপদেশ করিয়া চেতন-শ্বেতকেতুর আত্মারূপে তাঁহাকেই (শাস্ত্রে) গ্রহণ করিয়াছেন"*।

১৩৬। ফলতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ এত নিকট যে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যবধান নাই। পরমাত্মাই জীবাত্মার আশ্রয় ও প্রকাশক। তাঁহা হইতেই আমাদের আত্ম-বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে। "তংহদেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং" ইতিশ্রুতি। সেই পরমাত্মা আমাদের আত্মবুদ্ধি প্রকাশ করিতেছেন। "স পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে" জীবাত্মা স্বয়ং তিষ্ঠিতে পারেনা, সে পরমাক্ষর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু "এষহি দ্রষ্টা, স্প্রষ্ঠা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ঐ প্রতিষ্ঠাতেই জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। কিন্তু স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব জীবাত্মার তিষ্ঠিবার আশ্রয় নহে। সে কর্ত্তৃত্ব দ্বারা জীবাত্মা প্রকাশিতও হয় নাই।

* শাঃ ভাঃ ৬ সূঃ।

সুতরাং ব্রহ্মই তাহার আশ্রয় ও প্রকাশক। উপনিষদের এই ভাব উক্ত "তত্ত্বমসি" বাক্যের ব্যাখ্যাতে বেদান্তসার ও পঞ্চদশী প্রভৃতি সকল বৈদান্তিক শাস্ত্রেই রক্ষিত হইয়াছে। এই মনোহর ভাবের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া এবং ভক্তিপূর্ব্বক শাস্ত্র পাঠ না করিয়া যাঁহারা "অদ্বৈতবাদ" শব্দের উচ্চারণ মাত্রে ভয় পান তাঁহারা ইহার অমৃত-রসে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

১৩৭। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের যেরূপ তাৎপর্য্য বিস্তারিত রূপে নিবেদন করিলাম সমুদয় মহাবাক্য গুলির তাৎপর্য্য তাহারই অনুযায়ী; সুতরাং অবশিষ্ট গুলির বিশেষ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

১৩৮। মহাবাক্য সকল বেদান্ত-কল্পতরুর অক্ষয় ফল-যুথি-পুষ্প স্বরূপ। পণ্ডিতেরা তাহার তাৎপর্য্য মাত্র জ্ঞাত হয়েন, কিন্তু শান্তস্বভাব সাধকেরাই তাহার পুষ্প ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এই সকল মহাবাক্যের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে চেষ্টা করা সমুদয় ভগবৎ-ভক্ত লোকের প্রয়োজন। কারণ তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই কাম-কর্ম্ম-বীজ-স্বরূপিনী অবিদ্যার বন্ধন মোচন হইতে পারে।

শঙ্করাচার্য্যের বৈদান্তিক মত।

১৩৯। বেদান্তশাস্ত্রে যেরূপ সূক্ষ্ম অভিপ্রায়ে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ও জগদাত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্ম সত্য এবং জীব ও জগৎ মিথ্যা এই প্রকার মত প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা সামান্যতঃ পুর্ব্বোক্ত পারিভাষিক শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা হইতেই জানা

যাইতেছে। এইক্ষণ শাঙ্কর-দর্শনে উক্ত প্রকার মত যে ভাবে আছে তাহাই বলিতেছি।

১৪০। উপনিষদে যে প্রেমপূর্ণ অদ্বৈতবাদ ছিল, ব্যাস-সূত্রের ভাষ্যে, শঙ্কর তাহাই স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যে কতদূর চিন্তাশীল ছিলেন তাহা তাঁহার ভাষ্য বেস করিয়া না পড়িলে বুঝা যায় না। আমরা এই বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থ ও বাহ্য আমোদেই উন্মত্ত। সুতরাং শঙ্করের গভীর-জ্ঞান-সাগরে অবগাহন করিতে আমাদের অবসর, সাহস ও উৎসাহ নাই।

১৪১। শঙ্করের অদ্বৈতবাদরূপ একার্ণবে ডুব দিয়া দেখিলে জগৎ এবং জীবের অস্তিত্ব সংবৃতরূপে দৃষ্ট হয়। ফলতঃ শঙ্কর-ভাষ্যের প্রত্যেক পত্র তদুভয়ের দ্বৈত-সত্তাকে কখন উহ্য কখন বা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যের অধিকাংশ স্থলে ঈশ্বরকে সর্ব্বাত্মারূপে দৃষ্টি করিয়া জীবকে তাহার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়াছেন। ব্রহ্মই জীবের আমিত্ব, ইহাই দর্শাইয়া জীবের স্বীয় আমিত্বকে গোপন রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আপাততঃ তাঁহার ভাষ্য-পাঠে বোধ হয় যে, জীব যেন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ নহে। এবং যেখানে যেখানে জীবকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় সেখানেও আপাততঃ যেন তাহাকে মিথ্যা স্বরূপ ও জড়ের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং ব্রহ্ম-কেই আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মারূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু শঙ্করের এই সুসূক্ষ্ম অধ্যাত্মতত্ত্বের মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রবেশ করিলে জীবকে কখনই ব্রহ্ম অথবা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। শঙ্কর আপনার অদ্বৈতবাদের আপনি যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন নিম্নে তাহাই দর্শাইয়া এই কথা সপ্রমাণ করিতেছি।

১৪২। তিনি শারীরক সূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া অদ্বৈত-বাদের একটি মূল যুক্তি উদ্ভাবন করিয়াছেন, এবং সেই যুক্তিই সমুদয় ভাষ্যে প্রতিপাদন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। উক্ত যুক্তির সংক্ষেপ মর্ম্ম এই।

১৪৩। "যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয় এবং অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ী এ উভয়ে পরস্পর তমঃ-প্রকাশবৎ বিরুদ্ধ স্বভাব। সুতরাং একের ভাব অন্যেতে সঙ্গত হয় না। ইহা সিদ্ধই থাকাতে, একের ধর্ম্মও অন্যেতে সংলগ্ন হওয়া অসম্ভব। এই হেতু অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ী চৈতন্যেতে যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ের বা তদ্ধর্ম্মের যে অধ্যাস অথবা তাহার বিপরীত বিষয়ীর ধর্ম্ম-বিষয়েতে যে অধ্যাস তাহাকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যায়। তথাপি সেই উভয়ের স্বরূপ বিবেচনায় অনবধানবশতঃ পরস্পরেতে পরস্পরের স্বরূপ ও ধর্ম্ম অধ্যাস করিয়া সত্যস্বরূপ পরমাত্মার সহিত মিথ্যা জীবের ঐক্য-ভ্রান্ত প্রযুক্ত অত্যন্ত বিরোধী সেই ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর স্বরূপ অনবধারণ জন্য লোকে আমি আমার ইত্যাদি অনাদি-সিদ্ধ অসত্য-ব্যবহার আবহমান চলিয়া আসিতেছে"*।

১৪৪। শঙ্করের এই বাক্যের মধ্যে যে সকল শব্দ আছে অগ্রে তাহার অর্থ বুঝা যাউক, পশ্চাৎ সমুদয় যুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাইবে।

১৪৫। "যুষ্মৎ" শব্দে "তুমি"। "অস্মৎ" শব্দে "আমি"। "বিষয়" শব্দে যাহাকে লইয়া ব্যবহার করা যায়। "বিষয়ী" শব্দে যে ব্যবহার করে। "ধর্ম্ম" শব্দে "গুণ"। এবং পূর্ব্বে

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত ভাষা।

বলিয়াছি যে, অধ্যাস শব্দে এক বস্তুতে অন্যবস্তুর জ্ঞান—ইহাকে "আরোপ"ও কহে।

১৪৬। এখন তাৎপর্য্যে মনোনিবেশ করা যাউক। সাধনাকালে মানব পরমাত্মাকে "তুমি" বলেন এবং আপনাকে "আমি" বলেন। অতএব এখানে "তুমি" শব্দ পরমাত্মাকে এবং "আমি" শব্দ জীবাত্মাকে নির্দ্দেশ করিতেছে *। পরমাত্মাকে লইয়াই জীবাত্মার ব্যবহার। সুতরাং পরমাত্মা বিষয়, ধর্ম্ম ও গুণ; জীবাত্মা বিষয়ী, ধর্ম্মী ও গুণী। কিন্তু তমঃ ও প্রকাশ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব—উভয়ের মধ্যে ঐক্য নাই, তদ্রূপ, বিষয় আর বিষয়ীতে অর্থাৎ পরমাত্মা আর জীবাত্মাতে ঐক্য নাই। বিষয়রূপ পরমাত্মার ধর্ম্ম চৈতন্য, বিষয়ীরূপ জীবাত্মার ধর্ম্ম অহঙ্কারাদি। উহার এই সকল ধর্ম্ম পরমাত্মাতে আরোপ হইতে পারে না এবং পরমাত্মার ধর্ম্ম যে চৈতন্য বা জ্ঞান তাহাও জীবাত্মাতে আরোপ হইতে পারে না। কেন না ঐ উভয়ের ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। তথাপি সত্যস্বরূপ পরমাত্মার ধর্ম্মকে লোকে মিথ্যা জীবেতে অধ্যাস করত "আমি" "আমার" ব্যবহার করিতেছে। শঙ্করের এই সব কথার তাৎপর্য্য এখন বিশদরূপে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

১৪৬(ক)। তিনি পরমাত্মাকে সত্যস্বরূপ এবং জীবাত্মাকে মিথ্যা বলিয়াছেন। একথার তাৎপর্য্য এই যে, যদি পরমাত্মা না থাকিতেন তবে সৃষ্টি হইত না। আকাশ, বায়ু, জল প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রপঞ্চ, জীব ও তাহার সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ

---

* "তুমি," "আমি," শব্দের ন্যায় বেদান্তশাস্ত্রে নানা স্থানে, "তৎ" "ত্বং", "তৎ" "এতৎ", "স্বয়ং" "অন্য," "ত্বং," "অহং" প্রভৃতি শব্দও এইরূপ ব্যাখায় গৃহীত হয়।—পঃ দঃ ৬। ৪৯।

প্রভৃতি কিছুই হইত না। সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাত্মা কেবল আপনাকে "আমি" বলিয়া এবং সৃষ্টবস্তু সমুদয়কে "ইদং" বলিয়া জানিয়াছিলেন। সে সকল বস্তু স্বরূপতঃ মিথ্যাই, কেন না তিনি না সৃষ্টি করিলে তৎসমূহ প্রকাশ পাইত না। কেবল এই তাৎপর্য্য ব্যতীত ব্যবহারিক রূপে জগত ও জীবকে শঙ্কর মিথ্যা বলেন নাই। এই প্রকাণ্ড সৃষ্টির যে ভাগ জড় তাহা ব্রহ্মকেও জানে না, আপনাকেও জানে না। যে আপনাকে জানে সেই আত্মা। এই সৃষ্টির যে ভাগ জীব তাহাই আপনাকে জানে। তাহারাই প্রত্যেকে আপনাকে "আমি" বলিয়া জানে। কিন্তু জীবাত্মাতে পরমাত্মার বিশেষ অধিষ্ঠান ব্যতীত কি সাধ্য যে জীবাত্মা আপনাকে "আমি" বলিয়া অনুভব করে। জড়েরা তো সেরূপ আমিত্ব-বোধে পারক হয় না। কেন হয় না? না, তাহাদিগের মধ্যে পরমাত্মার সেই বিশেষ অধিষ্ঠান নাই যাহা জীবেতে প্রবেশ করিয়া জীবের আমিত্ব-বোধ প্রকাশ করিয়াছে। জড়েতে পরমাত্মার তাদৃশ আবির্ভাব কেন নাই? এ কথার প্রতি শঙ্করের উত্তর এই যে, তিনি জড়কে আপনার সাদৃশ্য প্রদান করেন নাই। কিন্তু জীবকে আপন সাদৃশ্য* দিয়াছেন। কেবল এই সাদৃশ্য জন্যই জীবেতে তিনি প্রতিফলিত হন। রজতের প্রভা অঙ্গারে প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু শুক্তিতে হইতে পারে। সেইরূপ ব্রহ্মের আত্মবোধ-উৎপাদক প্রভাব জড়েতে আবির্ভূত হইতে পারে না, কিন্তু জীবাত্মাতে পারে। যদিও জীবাত্মাতে পরমাত্ম-সাদৃশ্য সৃষ্টি-কালেই প্রদত্ত হইয়াছে,

---

* ইতিপূর্ব্বে ১২০ ক্রম ও সৃষ্টিগ্রন্থে ৭৮ ক্রম দেখহ।

তথাপি ব্রহ্মের নিত্য অধিষ্ঠান ব্যতীত, তাঁহাকে নিয়ত অবলম্বন ব্যতীত জীবাত্মাতে "আমি" বুদ্ধির উদয় হইতে পারে না। অতএব আত্ম-বুদ্ধি-শূন্য জড়বৎ উপাধিমাত্র দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমানী যে মূল জীবাত্মা তাহাই প্রত্যেক দেহে বিশেষ বিশেষ। তাহার স্বভাব চেতন, তাহাই শরীরের অধ্যক্ষ, প্রাণের ধারয়িতা এবং অহঙ্কারের আধার। তাহাই ভোক্তা ও শুভাশুভ কর্ম্মের কর্ত্তা। কিন্তু তাহাতে যে "আত্ম-বুদ্ধি" জন্মে তাহা সেই পরমাত্মার আবির্ভাব ও অবলম্বন বশতঃ জন্মিয়া থাকে, যিনি সামান্যতঃ সকল জীবে "আত্ম-বুদ্ধি" প্রকাশ করিতেছেন। তাদৃশ প্রকাশ ব্যতীত জীবাত্মা আত্মা-শব্দেরই বাচ্য হইত না। কিন্তু পরমেশ্বরের আবির্ভাবও যাহা, দৃষ্টিও তাহা, প্রতিবিম্বও তাহা, স্বরূপও তাহা—তাহা তাঁহারই আত্মস্বরূপ। সুতরাং তিনিই স্বয়ং জীবের আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মারূপে প্রকাশ পান। তাহাতেই জীবাত্মা আপনাকে আমি বলিয়া বোধ করে।

১৪৭। এস্থানে বিচার্য্য কথা এই যে, শঙ্কর প্রথমে বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা তমঃপ্রকাশবৎ বিরুদ্ধ-স্বভাব—তাঁহাদের একের ধর্ম্মের অন্যে ঐক্য হয় না। শেষে বলিলেন যে, জীবাত্মাতে পরমাত্মার সাদৃশ্য থাকাতেই জীবাত্মা তাঁহা হইতে আত্ম-বোধ পাইতেছে। এই সাদৃশ্য কি ঐক্য-স্থল নহে? ইহার উত্তর এই যে, সহস্র সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ে একধর্ম্মী নহে। শুক্তি আর রজতে, রজ্জুতে আর সর্পে, স্থাণুতে* আর পুরুষেতে যেরূপ সাদৃশ্য তাহা যেমন

* মুড়া গাছ।

ঐক্য-বাচক নহে, পরমাত্মাতে আর জীবাত্মাতে যে সাদৃশ্য তাহাও সেইরূপ ঐক্য-বাচক নহে। অতএব জীবাত্মাতে "আমি" এইরূপ যে একটি আশ্চর্য্য আত্মবোধ আসিতেছে তাহা পরমাত্মারই আবির্ভাব। তাহাই লইয়া জীবাত্মা "জীবাত্মা" হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহা জীবাত্মার নিজ ধর্ম্ম নহে। জীবাত্মার যাহা নিজ ধর্ম্ম তাহা যৎসামান্য অহঙ্কারাদি মাত্র। তাহাতে পরমাত্মীয় আমিত্ব তাদাত্ম্যভাবে সংলগ্ন হয় না, এবং পরমাত্মার ধর্ম্ম যে নির্ব্বিশেষ চৈতন্য তাহাও জীবাত্মার ধর্ম্মে প্রয়োগ হইতে পারে না।

১৪৮। যদিও উভয়ে এমত বিরুদ্ধধর্ম্মী, তথাপি লোকে পরমাত্মার আলম্বনেই "আমি" "আমার" ইত্যাদি বোধ লাভ করিয়া তাহা ঐ পূর্ব্বোক্ত সাদৃশ্যবশতঃ জীব-ধর্ম্মে অধ্যাস করে। যিনি প্রকৃত "আমি" তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া তুচ্ছ এক জীবত্বেতে সেই "আমিত্ব" আরোপ করে। এবং কাজেকাজেই তাঁহাতে অর্থাৎ "আমি"তে শরীর, মন, বুদ্ধি, জীবাত্মা প্রভৃতির ধর্ম্ম অধ্যাস করিয়া থাকে। তাঁহাকে অনাত্মা জীবেতে বদ্ধ করিয়া আত্মা ও আমি করিয়া লয় এবং আপনার তদ্রূপ আমিত্বকে অহংকারের সহিত বিমিশ্রণপূর্ব্বক স্বতন্ত্র রাখিয়া পরমাত্মাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে তুমি বলা যাইতে পারেনা। তিনি আমিই। তিনিই জীবাত্মা। আর জীবাত্মা যে সে তিনি অভাবে জড় সুতরাং মিথ্যা।

১৪৯। পরমাত্মা জ্ঞান, আনন্দ ও সাক্ষী। জীবাত্মা মনোবুদ্ধি অহংকারের আধার, কর্ত্তা ও ভোক্তা। জীবাত্মা অবিদ্যাবশতঃ পরমাত্মার আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ প্রকৃত ভাব না পাইয়া স্বীয়

মনোবুদ্ধি অহংকার দ্বারা, তাঁহার অবলম্বনেই তাঁহাকে রচনা করে। তাহাতে পরমাত্মাতে জীব-ধর্ম্মের অধ্যাস হয়। আবার জীবাত্মা, ঐ অবিদ্যাজন্যই, আপনার আশ্রিতভাব ও আত্মবুদ্ধির আলম্বন স্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়ভাবকে বিস্মৃত হইয়া অহংকার-বিমূঢ় আপনাকেই মুখ্য-আত্মারূপে গ্রহণ করে। তাহাতে জীবাত্মাতে আশ্রয় স্বরূপ পরমাত্ম-ধর্ম্মই অধ্যস্ত হয়। কিন্তু উভয় প্রকার অধ্যাসই অসত্য।

১৫০। শঙ্করের ভূমিকার এই তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে যে সকল পারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য্য দিয়াছি, তাহার সহিত ঐ তাৎপর্য্যের ঐক্য করিলেই জীবের দ্বৈত-সত্তার সহিত অদ্বৈত-বাদের মনোহর অভিপ্রায় অবগত হওয়া যাইবে। যদিও সমগ্র শারীরক-ভাষ্যে ঐ অভিপ্রায় সামান্যতঃ সঞ্চরিত আছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে শঙ্কর স্পষ্টরূপে দ্বৈতবাদ প্রতি-পাদন করিয়াছেন। ফলে তাদৃশ উক্তি সকল তাঁহার অদ্বৈত-বাদের বিরোধী নহে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তাহার মূল-উদ্দেশ্য-প্রকাশক।

১৫১। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য কেবল সৃষ্টির পূর্ব্ব এবং মহাপ্রলয়ের পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে, পরমেশ্বরের অন্তরাত্মত্ব ও সর্ব্বপ্রকাশকত্ব বশতঃ, এবং নির্ব্বিকল্প-সমাধি-কালে জীবাত্মা ব্রহ্মানন্দে একীভূত হওয়া সম্বন্ধে জীব ব্রহ্মে ঐক্য অথবা জীব ও জগৎ মিথ্যা বলিয়াছেন। তিনি কেবল ঐ সকল অবস্থা উপলক্ষেই বলিয়াছেন যে, সকলই মিথ্যা কেবল পরমাত্মাই সত্য। কিন্তু ব্যবহারিক অবস্থায় শঙ্কর স্পষ্ট ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

১৫২। যখন এই ভারত-রাজ্যে কোটি কোটি লোক

ফল-কামনায় আসক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডকে আদরপূর্ব্বক ব্রহ্ম-জ্ঞানকে তাচ্ছল্য করিতে লাগিল, যখন নানা প্রকার বাদীরা জগৎকে সত্য বলিয়া জগৎপতিকে পরিত্যাগ করিল, যখন ভারতীয় রাজগণ সুখাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া সংসারের স্বামীকে বিদায় দিয়া সংসারকে সার করিলেন, যখন ভারত-লক্ষ্মী তাদৃশ ব্যসনাসক্ত রাজগণকে পরিত্যাগ করণার্থ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তর গমনোদ্যত ষট্পদ সদৃশ চঞ্চল হইয়া উঠি-লেন, তখন ভারতভূমির পারমার্থিক রাজ্যকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে শঙ্করাচার্য্য বৈদান্তিকী সরস্বতীকে ভারতের সিংহাসন প্রদান করিলেন এবং বেদান্তশাস্ত্রকে পুনঃপ্রচার করিয়া কর্ম্ম-কাণ্ডের অনিত্যতা, জগতের অসত্যতা, সংসারের ঐন্দ্রজালি-কতা ও এক মাত্র পরমেশ্বরেরই সত্যতা জ্ঞাপন করিলেন। জীবব্রহ্ম, জগদ্‌ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সত্য এবং তাঁহা অভাবে জগৎ ও জীব মিথ্যা এইরূপ ঘোষণা দ্বারা শঙ্কর বৈদান্তিক মত প্রচার করিলেন। তিনি কেবল সত্যেরই সম্মানার্থে পারমার্থিকভাবে ঐরূপ অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এবং পুনশ্চ কেবল সত্যেরই সম্মানার্থে ব্যবহারিক অবস্থায় দ্বৈতজগৎ ও দ্বৈতজীব স্বীকার করিয়াছেন। কালবশে ভারতীয় আর্য্য-রাজ-স্বাধীনতা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিলুপ্তপ্রায় শ্রুতি-শাস্ত্র ও ব্যাস-সূত্র সমূহকে তিনি স্বীয় ভাষ্য দ্বারা পুনঃ-প্রকাশ করিয়া ভারতের অন্তঃসার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ভারতের পতিত সন্তানগণ অভিনব চাক্‌চক্য-বিশিষ্ট ইউরোপিয় অকিঞ্চিৎকর দর্শন ও বিষয়-বিদ্যাতে যতই মোহিত হউন, কিন্তু ভারত-জননীর সুজাত সন্তানেরা শঙ্করের ঋণে চিরবদ্ধ থাকিবেন।

১৫৩। সে যাহা হউক, এখন ব্যবহারিক জগৎ ও জীবের সম্বন্ধে শঙ্করের দ্বৈতমত যে প্রকার তাহারই বিবরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১৫৪। ব্যবহারিক অবস্থায় শ্রুতি ও ব্যাস-সূত্র সমুদয়ই দ্বৈত-প্রতিপাদক। শঙ্করাচার্য্য তাহারই ভাষ্য করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ভাষ্য তাদৃশ স্থলে স্পষ্ট বাক্যে দ্বৈতই প্রতিপাদন করিতেছে। তাহার প্রমাণার্থে আমি নিম্নে সংক্ষেপে কতিপয় কথা নিবেদন করিতেছি।

১৫৫। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যের ভূমিকাতেই জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী বলিয়াছেন, এবং আরো বলিয়াছেন যে, জীবাত্মাতে পরমাত্মার সাদৃশ্য * আছে। সে সাদৃশ্য দ্বৈত-প্রতিপাদক।

১৫৬। অতঃপর ১অঃ ১পাঃ ১৭ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন "যিনি লব্ধা তিনিই লব্ধব্য হইতে পারেন না"। পরমেশ্বর "অবিদ্যা-কল্পিত, ঔপাধিক, কর্ত্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞানাত্মা জীব হইতে ভিন্ন হয়েন"।

১৫৭। ১অঃ ১পাঃ ৪র্থ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, "একমেবাদ্বিতীয়ং"। এই শ্রুতির এইরূপ অর্থ যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নাই। এই অর্থ তত্ত্বজ্ঞানের উত্তরকালেই লগ্ন হয়। "তত্ত্বমসি" "তুমিই ব্রহ্ম, এই যে ব্রহ্মাত্মভাব ইহা শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতীত (ব্যবহারিক অবস্থায়) অবগত হওয়া যায় না"। ৬সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, "তত্ত্বমসি" "তুমিই তিনি, এই শ্রুতিতে প্রকৃত সৎকে আত্ম-শব্দে উপদেশ করিয়া, চেতন

* ২৪ সূঃ ১অঃ ১পাঃ।

শ্বেতকেতুর আত্মারূপে তাঁহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন"। এস্থানে "চেতন শ্বেতকেতুর" স্বীয় জীবাত্মাকে উহ্যরূপে স্বতন্ত্র রাখিয়া, আবার স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, "জীবের স্বভাব চেতন, জীব শরীরের অধ্যক্ষ, এবং প্রাণের ধারয়িতা" এই বিচার দ্বৈত-প্রতিপাদক।

১৫৮। ১অঃ ১পাঃ ১২সূঃ অবধি ১৯ সূত্র পর্য্যন্ত যে অধি-করণ তাহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—যথা; ব্রহ্মই মুখ্য-আত্মা, জীবাত্মা অমুখ্য-আত্মা। কিন্তু আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই ঐ অমুখ্য-জীবাত্মার অন্তরতম মুখ্য-আত্মা। আর জীবাত্মা পঞ্চকোষে আবদ্ধ। কিন্তু পরমাত্মা তাহার প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ পঞ্চকোষাব-চ্ছিন্ন বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ নামক জীবান্তরাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ থাকিলেও ঐ ত্রিবিধ চৈতন্য দ্বারা সুরক্ষিত জীব হইতে তিনি ভিন্নই। "তিনি রসস্বরূপ তৃপ্তি-হেতু, সেই রস লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন"। এস্থলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১৫৯। ১অঃ ১পাঃ ২১ সূত্রের ভাষ্যে স্পষ্ট কহিয়াছেন যে, যে যাহার অন্তর্যামী সে তাহা হইতে স্বতন্ত্র। অতএব শরীরাভিমানী জীব হইতে অন্তর্যামী ঈশ্বর ভিন্নই।

১৬০। ঐ অধ্যায়ের ঐপাদের ৪র্থ সূত্রের ভাষ্যে আছে যে, ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত যে আত্মা তাহাই ভোক্তা। কিন্তু পরমাত্মা ভোগ-রহিত তিনি সাক্ষী মাত্র। জীবাত্মাই অহংজ্ঞানের বিষয়, কিন্তু পরমাত্মা সেই জ্ঞানের সাক্ষী মাত্র।

১৬১। ১অঃ ১পাঃ ১সূত্রে কহিয়াছেন যে, কেহ কেহ "দেহাদি-ব্যতিরিক্ত সংসারী জীবকে আত্মা কহে" কিন্তু পরমা-ত্মাই "আত্মা"। জীব "আত্মা" নহে। এস্থলে স্পষ্টই

বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্ম" নহে। তবে জীবকে অনাত্মা বলার কারণ এই যে, ব্রহ্মের অধিষ্ঠান ব্যতীত সে জড়ই—যেমন জ্যোতির অধিষ্ঠান ব্যতীত নেত্র অন্ধ।

১৬২। ১অঃ ২পাঃ ১৯ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, অন্তর্যামী হওয়া ব্রহ্মের ধর্ম্ম। জীব অন্তর্যামী নহে। কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন* উভয়ে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবের অন্তর্যামী স্বরূপে কহেন।

১৬৩। ১অঃ ৩পাঃ ১৯সূত্রে লিখিয়াছেন যে, জীবেতে ব্রহ্মের আবির্ভাব আছে—সেই জন্য জীবেতে ব্রহ্মের আরোপ হইয়া থাকে। ১অঃ ২পাঃ ২৪ সূত্রে কহিয়াছেন যে "বৈশ্বানর" শব্দে ব্রহ্ম। ১অঃ ৩পাঃ ৪২ ও ৪৩ সূত্রে "বিজ্ঞানময়কে" এবং "প্রাজ্ঞকে" ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ১অঃ ৪পাঃ ১৭ সূত্রেও "প্রাজ্ঞকে" ব্রহ্ম বলিয়াছেন। এস্থানে মনোযোগ পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদিরা "প্রাজ্ঞ," "তৈজস" ও "বিশ্বকে" যে জীব বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মই। আমি ইতি পূর্ব্বে যে পরিভাষা-বিবরণ দিয়াছি, তাহার "ব্যষ্টি সমষ্টি" ও "উপাধি" প্রকরণে দৃষ্ট হইবে যে, পরমেশ্বর যেমন কারণ-রূপে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বৈশ্বানর নামে কথিত হন, সেইরূপ তিনিই কার্য্যরূপে অর্থাৎ জীবরূপে প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ কথা দ্বারা জীব ও ব্রহ্ম অভেদ-বোধ হয়, কিন্তু ঐ সকল "প্রাজ্ঞ", "তৈজস" ও "বিশ্ব" শব্দ প্রাকৃতিক জীব শব্দের বাচ্য নহে। সে সমুদয়ই ব্রহ্ম-বাচক, কেবল জীবেতে অধিষ্ঠান বশতঃ সামানাধিকরণ্যে ও অভেদ-

* কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন শুক্ল-যজুর্ব্বেদের দুই শাখা। যাজ্ঞবল্ক্য তাহার প্রবর্ত্তক ছিলেন।

লক্ষণাদ্বারা কার্য্যরূপ ও জীব-সংজ্ঞা দ্বারা পরিচিত হয়েন। আর প্রাকৃতিক যে জীব তাহা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্রই। এস্থলে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, উপরি উক্ত সূত্রসকলে "প্রাজ্ঞ" শব্দকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে বটে কিন্তু "তৈজস" ও "বিশ্বকে" ব্রহ্ম বলেন নাই। তাহার উত্তর এই যে, উপরি উক্ত বৈশ্বানর শব্দই বিশ্ব-প্রতিপাদক। তাহার প্রমাণ এই যে, মাণ্ডুক্যোপনিষদে "বিশ্বের" স্থলে "বৈশ্বানর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অতঃপর উপরে যে "বিজ্ঞানময়" শব্দ আছে তাহাই "তৈজস"-বোধক, যে হেতু বিজ্ঞানময় কোষে তৈজসের অধিষ্ঠান প্রসিদ্ধ আছে। এতাবতা নবীন অদ্বৈত-প্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রে "প্রাজ্ঞ," তৈজস," ও "বিশ্বকে" যে জীব বলেন এবং তাহাকে কার্য্যরূপী পরমেশ্বর বলিয়া যে, ব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে গণ্য করেন, তাহা বাস্তবিক জীব নহে, কিন্তু জীবেতে ব্রহ্মের আবির্ভাব ও অন্তর্যামিত্ব মাত্র। কেবল লক্ষণা দ্বারা, জীব শব্দে উক্ত হয়। সুতরাং প্রাকৃতিক জীব ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রই। জীবের এইরূপ স্বতন্ত্র সত্তাই শঙ্করের অভিপ্রায়।

১৬৪। শঙ্করাচার্য্য ১অঃ ১পাঃ ২ সূত্রে লিখিয়াছেন যে, "জন্ম ব্যতিরেকে জীবের স্থিতি ও প্রলয় সম্ভব হয় না।" এ কথা দ্বারা তিনি জীবের জন্ম স্বীকার করিয়াছেন এবং ১অঃ ২পাঃ ১২ সূত্রে ঈশ্বরকে গম্য এবং জীবকে গন্তা কহিয়া ভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আরো ১অঃ ৩পাঃ ৫ সূত্রে জীবকে জ্ঞাতা এবং আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাকে জ্ঞেয় রূপে কহিয়াছেন। ১৮ সূত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, জীব প্রাপ্তা, ব্রহ্ম প্রাপ্য, এ দুইয়ের ঐক্য সম্ভবে না। ২অঃ ১পাঃ ২২ সূত্রের ভাষ্যে

কহিয়াছেন যে, জীব অল্পজ্ঞ, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ——জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে।

১৬৫। শঙ্করাচার্য্য ২অঃ ২পাঃ ৩৮ অবধি ৪০ সূত্রে কহিয়াছেন যে, ব্রহ্ম সৃষ্টি-কালে আপনার বাহির হইতে কোন উপাদান সংগ্রহ করেন না, সকলই আপনার শক্তির মধ্য হইতে প্রকাশ করেন, সুতরাং সমস্ত জগতই সেভাবে ব্রহ্মের সহিত অভেদ। অর্থাৎ সকলে তাঁহার শক্তি-ভুক্ত। পরে ঐ অঃ ৩পাঃ ৭ সূত্রে স্পষ্ট কহিয়াছেন যে, সৃষ্টি হইতে তাঁহার ভেদ আছে।

১৬৬। যদিও শঙ্কর অনেক স্থলেই পরমাত্মাকেই আত্মা এবং জীবকে অনাত্মা বলিয়াছেন, কিন্তু জীবকে একেবারে জড় বা মিথ্যা বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। ব্রহ্মকে মুখ্য আর জীবকে অমুখ্য আত্মা বলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ ২অঃ ৩পাঃ ৪০ সূত্রে জীবকে স্পষ্ট আত্মা কহিয়াছেন। সে আত্মা শব্দে পরমাত্মা নহে—কিন্তু কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে স্বাধীন জীবাত্মা। শঙ্কর ঐ সূত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বেদে যখন কথিত আছে যে, জীব যজ্ঞ করেন তখন অবশ্যই আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তিনি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র কর্ত্তা। বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি ঐ আত্মারই "করণ"*। সমাধি-কালে বুদ্ধি থাকে না, জীবাত্মাই সমাধির কর্ত্তাস্বরূপে অবস্থিতি করেন।

১৬৭। ৩অঃ ১পাদ ৫ সূত্রের ভাষ্যে লিখিত আছে যে,

---

* যাহার দ্বারা কর্ম্ম করা যায় তাহার নাম করণ—বুদ্ধি দ্বারা আত্মা কর্ম্ম করেন অতএব বুদ্ধি আত্মার করণ।

জীবেতে ঈশ্বরের অংশ মাত্র আছে কিন্তু সকল ধর্ম্ম নাই। এ কথাতেও জীব ব্রহ্মে ভেদই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

১৬৮। ৩অঃ ৩পাঃ ৫৪ সূত্রে ভাষ্য করিয়াছেন যে, জীব হইতেও ঈশ্বর মুখ্য প্রিয়, অতএব পরম স্নেহ সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিবেক। ৫৫ সূত্রে কহিয়াছেন যে, পরমেশ্বর আর জীবে ভেদ আছে, যেহেতু জীবের সত্তাতে পরমেশ্বরের সত্তা নহে বরং পরমেশ্বর থাকাতেই জীব আছে। সেই পরমেশ্বরকে জীব উত্তম জ্ঞান দ্বারা লাভ করেন। ৪অঃ ১পাঃ ১২ সূত্রে কহিয়াছেন যে, মুক্ত হইলেও ঈশ্বর-উপাসনা করিবেক। ৪অঃ ৩পাঃ ১৬ সূত্রে কহিয়াছেন যে, মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম-উপাসনা অপকৃষ্ট, আর বাক্য মনে ব্রহ্মোপাসনা উৎকৃষ্ট।

১৬৯। এইরূপে শঙ্করাচার্য্য পারমার্থিক ভাবে অদ্বৈত-বাদ স্থিরতর রাখিয়া ব্যবহারিক অবস্থায় নানা স্থানে দ্বৈতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বৈতই ব্যবহারিক। অদ্বৈতবাদ কেবল অত্যুন্নত-জ্ঞানানুরোধে—কেবল শাস্ত্র দৃষ্টিতে, কেবল অধিক ভক্তি জন্য এবং ব্রহ্মকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মীয় জ্ঞান করা এবং তাঁহার সর্ব্বব্যাপ্তিত্ব ঘোষণার নিমিত্তে। জগৎ অপেক্ষা এবং জীব অপেক্ষা ব্রহ্মকে অধিক আদর করার নিমিত্তে এই সকল উপাদেয় ভাব উৎপন্ন হইয়াছে। নতুবা এই ব্যবহারিক জগৎ বা জীব একেবারে নাই বলা অথবা এ সকলকে ব্রহ্ম বলা শঙ্করের উদ্দেশ্য নহে।

১৭০। অনেকে মনে করেন, বেদান্ত-শাস্ত্র বুঝি জগৎ নাই ও বাস্তবিকই জগৎকে ব্রহ্ম বলেন। তাই মনে করিয়া বেদান্তের বিরোধীগণ বেদান্তকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করেন, এবং তাহাই মনে করিয়া অদূরদর্শী পক্ষপাতীরা

বেদান্তকে আদরও করেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের কুব্যাখ্যাই যে প্রথমোক্তদিগের ঘৃণার কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ নাই বলা অথবা তাহার স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার করিয়া তাহাকে বাস্তবিক ব্রহ্মই বলা শ্রুতি, বেদান্তসূত্র ও ভাষ্যকারগণের উদ্দেশ্য নহে। যদি উদ্দেশ্য হয় তবে অনেক শ্রুতির তাৎপর্য্যে দোষ হয়। দৃষ্টান্ত; "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতিসূর্য্যঃ।" ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে। এই শ্রুতির অর্থ কর। যদি সূর্য্য ও অগ্নিকে নাই বল, তবে পরমেশ্বরের ভয়ে তাহারা কি প্রকারে উত্তাপ দিতে বা প্রজ্বলিত হইতে পারে? যদি ব্রহ্ম বল, তবে ব্রহ্ম আপনারই ভয়ে আপনি অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হন ও সূর্য্যরূপে উত্তাপ দেন এইরূপ "বদতোব্যাঘাত" ঘটে। অতঃপর বেদান্ত-সূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের ৭।১৬।১৭ সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাস জগৎকে সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ৭ সূত্রে কহেন, "অসদিতিচেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ" সতের প্রতিষেধ অসৎ, তাহা অসম্ভব। তাহা কেবল শব্দ মাত্র। বস্তুতঃ নাই। যেমন খ-পুষ্পের আভাস শব্দ মাত্রই—বস্তুতঃ নহে। অতএব "এই জগৎ অসৎ" এমত শব্দ ব্যবহারই হইতে পারে না। ১৭ সূত্রে কহেন; "সদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্য-শেষাৎ"। বেদে স্থান-বিশেষে জগৎকে সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ থাকা কহিয়া বাক্য-শেষে কহিয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগৎ সৎ ছিল—অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থাতে ব্রহ্মেতে অবস্থিত ছিল। এখনও ব্রহ্মাশ্রয়ে জগৎ সত্যরূপেই প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীমান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যও ঐরূপ ভাষ্য দ্বারা ঐ সূত্র সকলকে

স্বীকার করিয়াছেন। এতাবতা জগৎকে নাই বলা ও স্বয়ং ব্রহ্ম বলা বেদান্তের তাৎপর্য্য নহে। যেখানে যেখানে সেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইলে অথবা পরমার্থের বিচার-কালে জগতের প্রতি দৃষ্টি, নির্ভর বা শ্রদ্ধা থাকে না সুতরাং পরমার্থতঃ মিথ্যা হইয়া যায় এবং ব্রহ্মের জগৎ-ব্যাপিনী শক্তিকে অনুভব করিলে জগতের প্রত্যেক পদার্থের স্ব স্ব সত্তা বিস্মৃতিপূর্ব্বক, সকলকে ব্রহ্ম-শক্তিরই আবির্ভাব রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। এ সকল পারমার্থিক ভাব মাত্র, ব্যবহারিক ভাব নহে। এই পারমার্থিক ভাব উপার্জ্জন করাই ব্রহ্মবাদীগণের কর্ত্তব্য।

১৭১। আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যের যে গূঢ় অর্থ আছে তাহা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি। শরীরের মধ্যে জীবাত্মা থাকাতে শরীর যেমন যত্ন-বিশিষ্ট হয় এবং সেই জীবাত্মাই আমি পদ-বাচ্য, সেইরূপ জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মা বর্ত্তমান থাকাতে জীবাত্মা যত্ন-বিশিষ্ট হয়। সুতরাং পরমাত্মাই "পরম আমি" পদ-বাচ্য। দৃঢ়-ভক্তিজন্য এবং পরমার্থ-তত্ত্বানুরোধে সেই পরমাত্মাকেই আমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন অনিমিষ নয়নে ক্ষণকাল জ্বলন্ত-সূর্য্য-দর্শনে অপর সর্ব্ব পদার্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানীগণ সেই পরম আমিকেই আমি বলিয়া লাভ করত আপনাদের উপাধি মাত্র আমিত্বকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। নতুবা এমন কথনই মনে করিওনা যে, আপনাকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্ম বলিয়া কেহ কখন অনুভব করিতে পারেন। যাঁহারা অদ্বৈত-বাদের এরূপ অর্থ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-অবগতি নাই। তাঁহারা

কেবল লোকের মুখে শুনিয়া, অথবা অদূরদর্শী ব্যক্তিদিগের কৃত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সেরূপ আশঙ্কা বহন করিতেছেন।

১৭২। তাঁহারদিগের একটী বিশেষ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভগবান্ ব্যাসদেব বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদের ১৫ সূত্রে স্পষ্টই কহিয়াছেন এবং শঙ্কর স্বীয় ভাষ্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন যে, "প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি" মুক্ত ও ব্রহ্মের মধ্যে শ্রুতি এই বিশেষতা দর্শাইতেছেন যে, প্রদীপের যেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয় স্বরূপের দ্বারা হয় না, সেইরূপ মুক্তের জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হয়, কিন্তু ব্রহ্ম প্রকাশ ও স্বরূপ উভয়ের দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ঐ ১৭ সূত্রে কহেন। "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদ-সন্নিহিতত্বাচ্চ।" কেবল ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা। মুক্তদিগের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব নাই। এবং জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি ও ইচ্ছা নাই। ঐ ২১ সূত্রে কহেন "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ।" ব্রহ্মের সহিত মুক্তের একীভূত হওয়া যে উক্ত আছে, সে সাম্য কেবল আনন্দ-ভোগ বিষয়ে, কিন্তু সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে নহে। ব্রহ্ম আপনার অনুগত পুত্র ও দাসকে আপনার সহিত সমান রূপে আনন্দের ভাগী করিবেন। ফলে জগৎ-কর্ত্তৃত্ব মুক্তের প্রাপ্য নহে। এতাবতা জীব স্বতন্ত্র সত্তাতেই অবস্থিতি করিয়া অথচ ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মের সহিত উপভোগ করিবে, কিন্তু ব্রহ্ম হইবেক না। সে ব্রহ্মের ন্যায় স্বরূপতঃ সর্ব্বব্যাপী অথবা সৃষ্টি-কর্ত্তাও হইবে না এবং ব্রহ্মেতে মিশিয়াও যাইবে না। ঊর্দ্ধ-সদ্‌গতির অবস্থাতে ব্রহ্মের সহিত অভেদ পিতা পুত্র সম্বন্ধ জাত হইয়া সমানে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে। ইহারই নাম ব্রহ্মে

লীন হওয়া, ইহারই নাম ব্রহ্ম-লাভ, ইহারই নাম ব্রহ্ম হওয়া, ইহারই নাম "জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য"। ব্রহ্মের প্রতি ভক্তের অচল প্রেম ও ভক্তের প্রতি ব্রহ্মের অপার করুণা এই দুইটি আধ্যাত্মিক সত্যকে সমবেত করিয়া বেদান্ত-শাস্ত্র ভক্তকে এইরূপ পিতৃপদ ব্রহ্মত্ব প্রদান করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের প্রচার।

১৭৩। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, উপনিষৎ ও তাহার মীমাংসা স্বরূপ ব্যাসদেব-প্রণীত শারীরক সূত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং প্রাচীন ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত ব্রহ্ম-জ্ঞানের অনুশীলন প্রায়ই স্থগিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য অতি অল্প বয়সেই সাঙ্গ-বেদাধ্যায়ী হইয়া আর্য্য-ভূমির ঐ দুরবস্থা অবলোকন করত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের নিদান-স্বরূপ ব্রহ্ম-দান দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্ত ধরণীর উপকারার্থে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, কেবল মাতা মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। তিনিই একমাত্র মাতার আশা ভরসার যষ্টি-স্বরূপ ছিলেন। যখন পরমেশ্বরের প্রতি মনুষ্যের মমতা-বুদ্ধি জন্মে, তখন অপর সর্ব্বপ্রকার মমতার বন্ধনই ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম-গানে আর ব্রহ্ম-দানে মগ্ন হইয়া, মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্বীয় অভীষ্ট সাধনার্থে বহির্গত হইলেন। ফলতঃ বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনাদি শাস্ত্র যেরূপ বিস্তীর্ণ ও বহু-আলোচনা-সাধ্য, ব্রহ্মনাম ও ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচার যেরূপ বহু সময় ও আয়াস-সাধ্য, মানব-জীবন যেরূপ

অল্পস্থায়ী এবং সংসার যেরূপ অধ্যয়ন, প্রচার ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহাতে ত্যাগ-স্বীকার ব্যতীত সাধু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। পূজ্যপাদ শঙ্কর সংসার ত্যাগ করিয়া অনেক অবসর লাভ করিলেন, এবং জীবন অনিত্য, ইহা জানিয়া একাকী শত-জন-সাধ্য পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি পদ্মপাদ, হস্তামলক, সুরেশ্বরমণ্ডন এবং তোটক এই চারিজন প্রধান শিষ্য সমভিব্যাহারে বিবিক্ত-দেশে বাস পূর্ব্বক শারীরক-সূত্রের ভাষ্য, ভগবদ্গীতার ভাষ্য, দশোপনিষদের ভাষ্য এবং আরো কতিপয় গ্রন্থ প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহা শিষ্য-দিগকে অধ্যয়ন করাইলেন এবং বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে যেমন শাখা ছিল, আপন শিষ্য পরম্পরার নিমিত্ত সেইরূপ উপাধি সৃষ্টি করিলেন। প্রকৃতি-রাজ্যে যত রমণীয় দৃশ্য আছে, সেই সমুদয় মনোহর সংজ্ঞা দ্বারা শিষ্যগণের নাম-বিভাগ করিয়া দিলেন।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ।
৮ ৯ ১০
সরস্বতী ভারতীচ পুরীতি দশ কীর্ত্তিতাঃ॥

আদিতে এই দশ বিধ উপাধি দশ জন শিষ্যকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ক্রমে শিষ্য-পরম্পরা ঐ সকল উপাধি আবহমান হইতে লাগিল। ইহাঁরা সকলেই দণ্ডী এবং স্বামী নামে খ্যাত হইলেন। ইহাঁরদের ক্রিয়ানুসারে অনেককে সাম্প্র-দায়িক উপপদ প্রদত্ত হইয়াছিল—যথা কুটীচর, বহূদক, হংস এবং পরমহংস।

১৭৪। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে দিগ্বিজয় পূর্ব্বক বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিলেন। তাদৃশ

ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনাকে তিনি দণ্ডী স্বামীদিগের প্রধান ধর্ম্ম-রূপে সংস্থাপন করিলেন; কিন্তু দুর্ব্বলাধিকারীদিগের নিমিত্ত তিনি মূর্ত্তিমৎ-শিবোপাসনার ব্যবস্থা দিলেন। তিনি যে কেবলই যোগ-সাধন করিতেন বা সমাধি-অবস্থায় থাকিতেন এমত নহে। বৈদান্তিক-জ্ঞানালোচনায়, বৈদান্তিক-গ্রন্থ-রচনায় এবং দিগ্বিজয়ে তাঁহার অনেকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণ, মধ্য এবং কাশ্মীরমণ্ডল* পর্য্যন্ত উত্তর ভাগ জয় করিয়া কেদারনাথ তীর্থে গমন করেন এবং তথায় বত্রিশ বর্ষ বয়সে ইহলোক-লীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার জীবনে যে ব্রত ছিল তাহা এই রূপে সাঙ্গ হইল। কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি-তারকা এই ভব-সাগরের বিবেকী নাবিকগণের চক্ষুর সম্মুখে ধ্রুব-তারার ন্যায় চির দিনই গম্য-স্থান নির্দ্দেশ করিতে থাকিবেক।

নবীন অদ্বৈতবাদ।

১৭৫। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যের তিরোভাবের পর তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণের মধ্যে কতিপয় আচার্য্য তাঁহার প্রচারিত সরল-অদ্বৈতবাদকে নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারদের মতের স্থানে স্থানে শঙ্করাচার্য্যের মত হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদও হইয়াছে; বিশেষ তাহার স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম-যুক্তি ও শ্রুতি-ঘটিত এমন সকল দুর্ব্বোধগম্য তত্ত্ব আছে যে, তাহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করা যায় না।

---

* কাশ্মীরে এখনও সরস্বতী-পীঠ নামে শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম বর্ত্তমান আছে।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীসদানন্দযোগীন্দ্র-বিরচিত বেদান্ত-সার * ও শ্রীমদ্‌ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর-কৃত পঞ্চদশী প্রভৃতি আধুনিক বৈদান্তিক গ্রন্থসমূহের ঐরূপ ভাব। ফলে যদিও ভাবে দুর্ব্বোধগম্য, তথাপি উক্ত আধুনিক গ্রন্থসমূহে যে প্রকার শৃঙ্খলার সহিত অদ্বৈতবাদের বিজ্ঞান প্রণয়ন করা হইয়াছে, শঙ্করের বেদান্ত-ভাষ্যের কোন স্থলে অথবা তাঁহার প্রণীত অন্য কোন গ্রন্থে সে শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না। এই সব আধুনিক বৈদান্তিক গ্রন্থসমূহের মতই বর্ত্তমান সময়ে বৈদান্তিক মত বলিয়া চলিতেছে। প্রথম প্রথম পাঠ করিতে গেলে এই সকল গ্রন্থকে অত্যন্ত কঠিন ও নীরস বোধ হয়, কিন্তু তাহার জটিলতা যতই ভেদ করা যায়, তাহার মনোহারিতা ততই প্রতীয়মান হইতে থাকে। আমি ইতি-পূর্ব্বে পরিভাষা-বিবরণে সেই সকল গ্রন্থের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য বলিয়াছি। মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে সর্ব্বত্রেই দৃষ্ট হইবেক যে, অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মতের মধ্যে কেবল সুধা-মাখা দ্বৈতবাদই বিরাজ করিতেছে। কোন স্থানেই ব্রহ্মা-তিরিক্ত ভোক্তা ও কর্ত্তা স্বরূপ জীবাত্মার অভাব দেখা যায় না।†

* এই গ্রন্থ বারাণসী নগরে ২৬২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয় এবং শকাব্দা ১৬০০ শকে নৃসিংহ সরস্বতী তাহার "সুবোধিনী" নামে ও তৎপরে রামতীর্থ নামে এক দণ্ডী "বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী" নামে টীকা করেন।

† স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর সম্বন্ধে নবীন অদ্বৈতবাদিরা অনেক লিখিয়াছেন। অন্যান্য শাস্ত্রেও তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। সেই সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায় সামঞ্জস্য পূর্ব্বক সে বিষয়ের বিবরণ এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট-স্বরূপ আমার "সৃষ্টি" গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছি। তাহা দৃষ্টি করুন।

মন্তব্য।

১৭৬। এস্থলে আরো কিঞ্চিৎ মন্তব্য-কথা বলিয়া এই অদ্বৈতবাদের বিবরণ সমাপ্ত করি। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। ঐ ধর্ম্ম শব্দে শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, দান, সত্য, অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্ম নহে। উহার অর্থ যজ্ঞাদি কর্ম্ম। বৈদিক-যুগে অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মই নরের ধর্ম্ম ছিল। সুতরাং ধর্ম্ম বলিলে তাহাই বুঝাইত। কল্পসূত্র সকল ঐ সকল ধর্ম্মের ব্যবস্থাতেই পরি-পূর্ণ সুতরাং তৎসমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-মীমাংসাতে জৈমিনিদেব যজ্ঞাদি কর্ম্মেরই মীমাংসা করিয়াছেন। এইজন্য তাহার নাম ধর্ম্ম-মীমাংসা। ধর্ম্ম শব্দে যে আত্মার ধর্ম্ম তাহা অল্প দিন হইতে বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছে। বেদান্তে ঐ সকল আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম এক মাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই মধ্যগত। ব্রহ্ম-জ্ঞানের অর্থ অতি বিস্তীর্ণ। ভক্তি, সাধু-ব্যবহার, অধ্যয়ন, উপাসনা, বৈরাগ্য, বিবেক প্রভৃতি সমুদয় তাহারই অন্তরঙ্গ। অতঃপর অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা জ্ঞানীর পক্ষে স্বর্গ, নরক, পুনর্জ্জন্ম, এ সকল স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, লোভী, ফল-কামনাসক্ত ও অজ্ঞানী দিগের বাসনানু-সারে ঐরূপ গতি হইয়া থাকে *—ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে ব্রহ্মাই

---

* গীতাতে আছে "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ"। বাসনাতে আবদ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বদা যাহা ভাবে, কলেবর ত্যাগ-কালে তাহাই তাহার স্মৃতি-পথে আরূঢ় থাকে; সে ব্যক্তি সুতরাং মৃত্যুর পর তাদৃশ গতিই লাভ করে। কিন্তু "অন্ত-কালেচ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরং যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ"। মরণ-কালে পরমেশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে, সে তাঁহাকেই লাভ করে। ইহাতে সংশয় নাই। ফলে যে ব্যক্তি সমস্ত জীবন পরমেশ্বরের

গতি, ব্রহ্মই স্বর্গ, ব্রহ্মই মুক্তি—অতএব ব্রহ্মোপাসক স্বর্গ লইয়া কি করিবেন? অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা ব্রহ্মকে লাভ করিবার প্রার্থনা ব্যতীত ব্রহ্মের নিকট অন্য কোন প্রার্থনা করিবার ব্যবস্থা দেন না। "ইহামুত্র ফলভোগবিরাগঃ" কি ইহকালের নিমিত্তে কি পরকালের নিমিত্তে সর্ব্ব প্রকার ফলভোগের আশা-ত্যাগকে তাঁহারা ব্রহ্ম-লাভের অন্যতম-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১৭৭। পরমারাধ্য ভগবান্ বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্ত-সূত্রের যত ভাষ্য আছে তন্মধ্যে শঙ্কর-প্রস্থানই অতি উৎকৃষ্ট। নবীন আচার্য্যগণ অনেকেই সেই প্রস্থান অনুসারে অদ্বৈতবাদকে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত সেই সকল বিবরণের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য বর্ণন করিলাম। এইক্ষণে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এই ত্রিবিধ মত প্রতিপাদক অপর তিন খানি ভাষ্যের অতি সংক্ষেপ বিবরণ প্রদান করিতেছি। সেই সকল ভাষ্য দুষ্প্রাপ্য, এজন্য নানাস্থান হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার অল্পমাত্র বিবরণ দিতে পারগ হইলাম।

রামানুজ-ভাষ্য অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

১৭৮। রামানুজ-ভাষ্য একখানি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ। রামানুজ দক্ষিণাপথে পেরুম্বুর নগরে শকাব্দা একাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের সার্দ্ধ তিন শত বর্ষ পরে জন্মগ্রহণ

সেবায় অর্পণ করিয়াছেন, অন্তকালে বিষয়-বাসনা-রহিত হইয়া তিনিই তাঁহাকে যথার্থ প্রীতি সহকারে স্মরণ করিতে পারেন। বিত্ত-মোহ-বিমূঢ় জনের তাহা সম্ভব হয় না।

করেন। তাঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য, মাতার নাম ভূমি-দেবী। তিনি কাঞ্চীপুরে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।* ইহাঁর কৃত বেদান্ত-ভাষ্য হইতে ইহাঁর এইরূপ মত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যথা—পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ, অচিত এবং ঈশ্বর। চিৎ শব্দে জীব। জীব অর্থাৎ জীবাত্মা—কর্ত্তা, ভোক্তা, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল-জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য। অচিৎ শব্দে সমস্ত জড়পদার্থ, তাহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই। তাহা ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন মাত্র। ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা, অপরিচ্ছিন্ন, জ্ঞানস্বরূপ; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজঃ প্রভৃতি গুণের আধার। তিনি সকলের অন্তর্যামী। জগৎস্থষ্টির প্রাক্‌কালে চিৎ ও অচিৎ উভয়ই সুক্ষ্ম অবস্থায় তাঁহারই অঙ্গরূপে অবস্থিতি করে; কিন্তু চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনের মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকে। সেই চিৎ ও অচিৎ তাঁহার ইচ্ছাতে স্থূল * জগৎ-রূপে পরিণত হইলে তিনি তাহাদের অন্তর্যামী হন। অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চিদচিৎ-বিশিষ্ট থাকেন, পরেও সেইরূপ স্থূলাবস্থায় পরিণত চিদচিৎ-বিশিষ্ট থাকেন। ঈশ্বরের এই নিত্য চিদচিৎ-বিশিষ্টতা স্বীকার করাতে, এই মতের নাম বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন কহেন যে, জীবাত্মা সকল ও জড়-জগতের উপাদান পরমাণু সকল ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র রূপে নিত্য কাল হইতে আছে ও প্রলয় অন্তেও স্থায়ী হইবেক। তাদৃশ মতই আপাততঃ প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বৈতবাদের বাচ্য। কিন্তু রামানুজ কহেন যে, নিত্য কাল হইতেই ঈশ্বর জীবাত্মাসমুহ

* See Wilson's Religious Sects of the Hindus Vol 1. P. 36. London 1861.

ও জড়-জগতের বিবিধ উপকরণের সহিত বর্ত্তমান আছেন এবং থাকিবেন। সুতরাং মহাত্মা রামানুজের মত অদ্বৈতবাদই হইতেছে।* শঙ্করের মতের সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে শঙ্কর স্পষ্ট বাক্যে ঈশ্বরকে নিত্য কাল হইতে চিৎ-অচিৎ-বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের মায়া-নামক প্রকৃতি হইতে জগৎ-সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মকে জীবের প্রকৃত আত্মা বলিয়া, সাংসারিক জীবাত্মাকে কোন মর্য্যাদা দেন নাই এবং ব্রহ্মকে সমস্ত জগতের আশ্রয় বলিয়া, জগৎকে অসার কহিয়া গিয়াছেন। কাজেই শ্রীমান্ রামানুজের মত অদ্বৈতবাদ হইয়াও ঠিক পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত অদ্বৈতবাদের ন্যায় নহে। অতএব ইহার বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ নামই যুক্ত হইতেছে। ফলে শঙ্করের মায়া, অজ্ঞান, অধ্যাস ও অধ্যারোপ প্রভৃতি আবরণ ভেদ করিয়া যে সার তত্ত্ব পাওয়া যায়, রামানুজের "ঈশ্বরের চিদচিৎবিশিষ্টতা" ভেদ করিলেও সেই সার তত্ত্বই পাওয়া যায়। এই আনন্দের বিষয়। তাঁহারা পরস্পর যতই বিবাদ করুন, আমরা দেখিতেছি যে, মূল অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ে তাঁহারদের একই মত, কেবল বিচারের ও ভক্তি-প্রকাশের প্রণালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। শঙ্কর পরমেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া প্রগাঢ় প্রেম-ভরে তাঁহার সহিত একাত্ম হইয়া যাইতেছেন—রামানুজ, প্রভুর শ্রীচরণ-সেবা করিতে করিতে

---

* পুরাণানুসারে ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও কাল একীভূত। তন্মধ্যে ব্রহ্মই পুরুষ এবং সেই ভাবই প্রধান। প্রকৃতি ও কাল ব্রহ্মের নিকৃষ্ট স্বরূপ। প্রকৃতি দ্রব্য-গুণ-বিশিষ্টা। তাহাই জড়-জগতের উপাদান। ব্রহ্ম কর্ত্তা। এই মতের রামানুজের মতের সহিত প্রায় ঐক্য হইতেছে। আমার সৃষ্টি-গ্রন্থে অব্যক্ত প্রকরণ দেখহ।

আপনাকে কতই ভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন। এই প্রভেদ অতি আনন্দজনক।

১৭৯। রামানুজ শঙ্করের মতে দোষারোপ করিয়া এই রূপ কহিয়াছেন যে, জগৎকে "রজ্জুসর্পবৎ" বলা অযুক্ত কথা, কারণ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা থাকিতে পারে না। তিনি সত্যসঙ্কল্প, যাহা করেন তাহাই সত্য। ঈশ্বর জীবের অন্তর্যামী—এই ভাবে তিনি জীবাত্মার সহিত অভেদ, ঠিক সেই প্রকার, যেমন আমি শরীর হইতে ভিন্ন হইলেও আপনাকে আপনি কখন কখন শরীরের সহিত অভেদ মনে করি। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" হে শ্বেতকেতো! তুমিই ব্রহ্ম, এই শ্রুতি-বাক্যের অর্থ এই যে, হে শ্বেতকেতো! তোমার জীবাত্মার যিনি অন্তরাত্মা তিনিই ঈশ্বর।* ফলতঃ শ্বেতকেতু স্বয়ংই যে ঈশ্বর এবাক্যের সে অভিপ্রায় নহে। "একমেবা-দ্বিতীয়ং" এ বাক্যের এমত তাৎপর্য্য নহে যে, কেবল এক ঈশ্বরই আছেন আর কিছু নাই। ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর স্বজাতীয়-ভেদ-রহিত। তাঁহার স্বজাতীয় দ্বিতীয় কেহ নাই। অর্থাৎ দুই ব্রহ্ম নাই। এক, এব, অদ্বিতীয়, এই তিন শব্দের দ্বারা সেই স্বজাতীয় দ্বিতীয়ের নিরাস করিয়াছেন। এই জগৎ ও জীব সকল স্বরূপতঃ তাহা হইতে পৃথকই। অথচ তিনি জগৎ ও জীব-বিশিষ্ট—অর্থাৎ সকলের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন এবং প্রাণস্বরূপে সকলের অন্তর্যামী। তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের সহিত

* "তৎ জীবাত্মসমাধিকরণোযোঽন্তরাত্মাসগুদ্ধবুদ্ধস্বভাববিশিষ্টঈশ্বরশ্চ এক এব ইতি প্রতিপাদ্যতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেন"। ফলতঃ শঙ্করের মতও তাহাই।

জগৎ ও জীবের এক ভাবে ভেদও আছে, একভাবে অভেদও আছে।

১৮০। উপনিষদে, শাঙ্কর-ভাষ্যে ও বেদান্তসূত্রে জীবাত্মা, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে বিচার আছে তাহার মধ্যে যে পরিমাণ অদ্বৈতবাদ প্রকাশ পায় তাহা কিছু মাত্র দোষের নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যে, পরমেশ্বর, পরমাণু ও জীবাত্মাকে সমভাবে নিত্য বলেন সেই রূপ দ্বৈতবাদই আপাততঃ দোষাবহ। অদ্বৈত মতে প্রথমতঃ তাহারই খণ্ডন। ঐ মতে ব্রহ্ম হইতেই সকল হইয়াছে। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে দ্বিতীয় কিছু ছিল না। অদ্বৈত মতের দ্বিতীয় তাৎপর্য্য কেবল প্রেম ও ভক্তি-পূর্ণ—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ রামানুজস্বামির মত, ঐ উভয় মতের মধ্যবর্ত্তী এবং প্রায় পৌরাণিক পুরুষ-প্রকৃতি-বাদের ন্যায়। ফলতঃ অদ্বৈত মতের পরম মনোহর তাৎপর্য্য অনেকে না বুঝিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, মানুষের আত্মা বুঝি যথার্থই ব্রহ্ম। জগৎ বুঝি বাস্তবিকই ভ্রম। কেহ কেহ বুঝিয়াছিলেন জগৎ বুঝি ব্রহ্মই এবং মৃত্যুর পর জীবাত্মা বুঝি ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। ব্রহ্ম হইতে বুঝি জীবাত্মার কোন স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। অদূরদর্শী লোকে এইরূপে উন্নত শাঙ্কর মতে যখন কলঙ্ক আনয়ন করিলেন, তখন রামানুজ আপনার বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে শারীরক-সূত্রের ভাষ্য করিলেন। তিনি ঐরূপ অদূরদর্শী, নামমাত্র অদ্বৈতবাদীদিগের গরলময় মতে দোষারোপ করিয়া কহিয়াছেন—

"নিরস্তাখিলদুঃখোঽহমনন্তানন্দভাক্‌স্বরাট্‌।
ভবেয়মিতিমোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ত্ততে॥

অহমর্থবিনাশেচেৎ মোক্ষইত্যধ্যবস্থতি।
অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথাপ্রস্তাবগন্ধতঃ॥"

আমি অখিল দুঃখ হইতে নিরস্ত হইব এবং স্বতন্ত্র থাকিয়া অনন্ত আনন্দের ভাগী হইব এই আশা করিয়া ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু "অহং" এই অর্থের বিনাশে যদি মোক্ষ স্থাপন হয় তবে তাদৃশ মোক্ষ-কথার প্রস্তাব ও গন্ধ মাত্রে আমি পশ্চাৎ ভাগে প্রস্থান করি।

মাধ্বাচার্য্যের ভাষ্য অথবা দ্বৈতবাদ।

১৮১। মাধ্বাচার্য্য শকাব্দা ১১২১ শকে, অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের আনুমানিক চারি শত বর্ষ পরে দক্ষিণাপথে তুলব দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মধিজী ভট্ট।* অনেকে অনুমান করেন যে ইনি প্রথমে শঙ্করাচার্য্যের মতস্থ শিষ্য ছিলেন—তখন ইহাঁর নাম আনন্দতীর্থ ছিল।† পশ্চাৎ দ্বৈতবাদের প্রতি ইহাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় উক্ত নাম পরিত্যক্ত হয়। ইনি বেদান্তসূত্রের ভাষ্য, দশোপনিষদ্-ভাষ্য ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাঁর মতে জীবাত্মা সূক্ষ্ম, নিরাকার ও অমর পদার্থ এবং ঈশ্বরের সেবক। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" এই শ্রুতির অর্থ এমত নহে যে, হে শ্বেতকেতো! তুমিই ব্রহ্ম। এস্থলে কর্ম্মধারয়-সমাস হইবে না। কিন্তু ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস দ্বারা "তৎ" শব্দের অর্থ

---

* Wilson's Religious Sects of the Hindus p. 139. London 1861.

† See foot-note p. idem of ditto; also সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ।

"তস্য" হইবেক। অতএব উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, "শ্বেতকেতো! তস্য ত্বং অসি" অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো! তুমি তাঁহারই, কি না, তুমি তাঁহারই নিয়ত সেবক, সহচর ও অনুচর। সুতরাং জীব ব্রহ্ম নহে। এই মতানুসারে পরমেশ্বর স্বতন্ত্র, কি না, পূর্ণ-স্বাধীন। জীব অস্বতন্ত্র, কি না, পরমেশ্বরের অধীন। যাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ-চিন্তাকে উপাসনা কহেন, অন্তে তাঁহারদের নরক হয়। জগৎ ব্রহ্মও নহে ভ্রমও নহে। অদ্বৈতবাদীরা জাজ্বল্যমান জগৎকে যে রজ্জু-সর্পবৎ বলেন এবং জীবেতে যে ব্রহ্মকে অধ্যাস করিতে যান তাহা অযুক্ত। অতএব জগৎ ও জীব সত্য এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। "একমেবাদ্বিতীয়ং" অদ্বৈতবাদীরা এই শ্রুতির এই অর্থ করেন যে, "ব্রহ্মই এক এবং অদ্বিতীয়"। অর্থাৎ যাঁহা হইতে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই তিনি অদ্বিতীয়। অদ্বৈত-বাদীদিগের এই প্রকার অর্থানুসারে জগৎ ও জীব থাকে না। অতএব সে অর্থ সম্পূর্ণ অসঙ্গত। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতিতে "একং" শব্দের অর্থ একমাত্র, কি না, বহু নহেন। "এব" শব্দের অর্থ "অন্য-যোগ-ব্যবচ্ছেদক" অথবা "ইতর-ব্যবচ্ছেদক" অর্থাৎ অন্য-সম্বন্ধাভাব—অন্য যে দ্বিতীয়াদি তাহার সহিত সম্বন্ধাভাব। যেমন কতিপয় পদার্থকে এক, দুই, তিন, চারি করিয়া গণনা করা যায়। তাহার প্রত্যেকটিই অন্য-যোগ-ব্যবচ্ছেদক, কি না অন্য হইতে স্বতন্ত্র, সেইরূপ পরমেশ্বরের একত্ব দুই, তিন, চারি প্রভৃতি অন্যান্য রাশি হইতে স্বতন্ত্র। "এব" শব্দের আর এক অর্থ "অযোগ-ব্যব-চ্ছেদক" অর্থাৎ যাঁহাতে সর্ব্বদা একত্ব যুক্তই আছে, কি না, যিনি রূঢ়-পদার্থ—যাঁহাকে বহুভাগে ভঙ্গ করা যায় না এবং যিনি

স্বরূপতঃ অনেক হইতে পারেন না। "শঙ্খঃপাণ্ডুরএব" শঙ্খের পাণ্ডুবর্ণ যেমন স্বভাব, পরমেশ্বরের একত্ব সেই প্রকার স্বভাব। অতঃপরঃ তিনি "অদ্বিতীয়ং"। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ এখানে জগৎ ও জীব। আর তিনিই প্রথম। তিনিই প্রথমাবধি আছেন। জগৎ ও জীব তাঁহারই সৃষ্টি। অতএব তিনি স্রষ্টা হইয়া সৃষ্ট-বস্তু হইতে পারেন না। সুতরাং তিনি অদ্বিতীয়। এস্থলে "অ" শব্দে "ন"। অর্থাৎ তিনি "ন দ্বিতীয়ং"। "স দ্বিতীয়ং ন"। দ্বিতীয় যে সৃষ্ট জগৎ ও জীব তাহা তিনি নহেন। যেমন "ব্রাহ্মণাৎ অন্য অব্রাহ্মণ" ব্রাহ্মণ হইতে যে অন্য তাহাকে যেমন অব্রাহ্মণ বলা যায়। সেই প্রকার "দ্বিতীয়াৎ অন্য অদ্বিতীয়"। দ্বিতীয়, কি না, জগৎ ও জীব হইতে যিনি অন্য তিনি অদ্বিতীয়। এতাবতা "এক-মেবাদ্বিতীয়ং" শ্রুতির অর্থ এই যে, পরমেশ্বর একই, এক ভিন্ন বহু নহেন এবং জগৎ ও জীব হইতে ভিন্ন। অদ্বৈতবাদীরা কহেন "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" পরমেশ্বর হইতে অপর কিছুই নাহি। এ অর্থ অসঙ্গত। এই শ্রুতির অর্থ এই যে, "এই এক ব্রহ্মোতে নানা পদার্থ নাহি"। অদ্বৈতবাদীরা জগৎকে যে ব্রহ্মোতে অধ্যাস করেন ইহাতে সে কথা খণ্ডন হইল। অপর, অদ্বৈতবাদীরা মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দকে যে প্রকার নাসা-বেষ্টন পূর্ব্বক অর্থ করেন, মাধ্বাচার্য্য তাহা না করিয়া লেখেন যে, ঐ সকল শব্দের অর্থ কেবল ঈশ্বরের সৃষ্টি-শক্তি মাত্র। ইহাঁর মতে অদ্বৈতবাদীরা কষ্টকল্পনা করিয়া ব্যাস-কৃত বেদান্তসূত্রের যে অর্থ করেন তাহা অতি অশ্রদ্ধেয়।

১৮২। মাধ্বাচার্য্যের তিরোভাবের পর বড় বড় আচার্য্য

এইমতে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সে সকল গ্রন্থ এ প্রদেশে কেহ অধ্যয়ন করে না। কেবল দক্ষিণাপথে তৎসমূহের বহুল অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইয়া থাকে।

১৮৩। মাধ্বাচার্য্য-প্রণীত দ্বৈতবাদকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অঙ্গীকৃত দ্বৈতবাদের সহ তুল্য করা যাইতে পারে না। উক্ত দর্শনদ্বয় জীবাত্মাকে ও জগতের উপাদান পরমাণুকে যেমন ঈশ্বরের সমকালবর্ত্তী বলেন এবং তাহা পূর্ব্বে সৃষ্টি হওয়ার উল্লেখ করেন না, মাধ্বাচার্য্যের সে প্রকার মত নহে। ইহাঁর মতে জগৎ ও জীব পরমেশ্বরের সৃষ্টি কিন্তু সৃষ্টির সহিত স্রষ্টা এক নহেন। রামানুজের মতের সহিতও মাধ্বাচার্য্যের মতের এক প্রকার ঐক্যই হইতেছে। যে ভিন্নতা আছে তাহা কেবল ব্যাখ্যার প্রণালীতে মাত্র। মাধ্বাচার্য্যও একজন রামানুজের সদৃশ ঈশ্বরভক্ত এবং যখন তিনি জীবকে ঈশ্বরের অধীন অথচ অস্বতন্ত্র বলিয়াছেন তখন অদ্বৈতবাদীদিগেরও গূঢ়তাৎপর্য্যের সহিত তাঁহার মত একই হইতেছে।

বল্লভাচার্য্যের ভাষ্য অথবা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।

১৮৪। বল্লভাচার্য্য শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের আট শত বর্ষ পরে আবির্ভূত হন। ইহাঁর নিবাস তৈলঙ্গ দেশে, এবং ইহাঁর পিতার নাম লক্ষণ ভট্ট। ইনি বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-মতানুসারে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। ইহাঁর মতে জগৎ ও জীব মায়াবিশিষ্ট নহে কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরেরই পরিণাম। শঙ্করাচার্য্যের মতস্থ অদ্বৈতবাদীরা যেমন জগৎকে “রজ্জুসর্পবৎ” বলিয়া

ব্রহ্মেতে অধ্যাস করেন, ইনি তাহা করেন না। কিন্তু ইনি জগৎ ও জীবকে ব্রহ্মের সহিত একেবারে অভেদ দৃষ্টি করেন। "রজ্জুসর্পবৎ" বা "শুক্তিকারজতবৎ" শব্দের পরিবর্ত্তে ইনি "অহিকুণ্ডলবৎ" অথবা "স্বর্ণকুণ্ডলবৎ" ইত্যাদি উপমা ব্যবহার করেন। অর্থাৎ যেমন সর্প হইতে সর্পের কুণ্ডল পৃথক্ নহে —যেমন স্বর্ণ হইতে স্বর্ণালঙ্কার পৃথক্ নহে সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ ও জীব পৃথক্ নহে। ইহাঁর মতে এই জগতের সকল পদার্থ ও সকল জীবই ব্রহ্ম। এই মত শঙ্করাচার্য্যের মতস্থ অনেক নবীন-অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের, রামানুজস্বামীর ও মাধ্বাচার্য্যের মতসকলের মূল যেমন উপনিষদে আছে এই শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের মূলও সেই প্রকার উপনিষদেই আছে। ফলে এই সব কথা সম্বন্ধে উপনিষদের যে সরল তাৎপর্য্য তাহা আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি।

রামমোহন রায়ের ভাষ্য।

১৮৫। বেদান্তদর্শন অধ্যয়নের পূর্ব্বে বা অন্ততঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপনিষৎ পাঠ করা যে নিতান্তই প্রয়োজন তাহার আর কথা নাই। বেদান্ত-দর্শন উপনিষদেরই মীমাংসা-গ্রন্থ, অতএব উপনিষৎ আর ব্যাসদেব-প্রণীত বেদান্তসূত্রকে একত্রেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এতদ্দেশের মধ্যে বেদান্ত-শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত নাহি।* যে কিঞ্চিৎ আছে তাহা

* মিথিলাতে বেদ বেদান্ত ও বেদাঙ্গের অনুশীলন বরং কিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু বঙ্গদেশে কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ই বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই আবদ্ধ। তাঁহারাও কেবল বিদ্যার অনুরোধে তাহা সংস্কৃত ভাষাতেই অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এমত অবস্থায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বেদান্ত-সূত্রের মর্ম্ম বুঝা কঠিন। যদিও উপনিষৎ ও বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে কএক খানি গ্রন্থ বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু মহর্ষি-ব্যাসোক্ত বেদান্ত-সূত্রের ষোড়শ পাদের মধ্যে কেবল প্রথম পাদ মাত্র শঙ্কর-ভাষ্য উলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পঞ্চদশ পাদের শঙ্কর-ভাষ্য এইক্ষণে সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনগণের পক্ষে গাঢ়-তিমিরাবৃত আছে। এমত দুরবস্থায় মহাত্মা রামমোহন রায়কে স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারি না।

১৮৬। অদ্য অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল, রামমোহন রায় যখন দেখিলেন মূল বেদান্তস্বরূপ উপনিষৎ ও তন্মীমাংসাস্বরূপ বেদান্ত-সূত্র সকল থাকিতেও এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবৃন্দ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে বঞ্চিত হইয়া আছেন; আবার তিনি যখন দেখিলেন সংস্কৃত জানেন না এমত ভদ্রলোকের সংখ্যাই দেশের মধ্যে অধিক, তখন তিনি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত দশোপনিষৎ যে মূল বেদান্ত, ও তাহার মীমাংসা সার্দ্ধপঞ্চশত-সূত্র-বিশিষ্ট যে বাদরায়ণ-সূত্র তাহা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি ১৭৩৭ শকে বেদান্ত-সূত্র মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি তাহার যে প্রকার বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়াছেন তাহা

যদিও অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি বেদান্তের সমুদয় সার তাৎপর্য্যই তদ্দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রের পারদর্শী না হইলে কিছুতেই ঐ রূপ ভাষ্য করা যায় না। যাঁহারা উহার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা উহা হইতে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছেন।*

১৮৭। ইহা এক প্রকার নির্যাস বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সময়ের বিদ্বান্ ঈশ্বরবাদীগণ, ঈশ্বর, প্রকৃতি, সংসার, ধর্ম্ম, উপাসনা ও পরলোক সম্বন্ধে যে প্রকার মীমাংসা প্রার্থনা করেন বেদান্ত-শাস্ত্র অধিকাংশতঃ তাহারই ভাণ্ডার।

১৮৮। এ স্থলে মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা ব্যক্ত না করিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করিতে পারি না। তিনি যে কেবল ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক ছিলেন এমন নহে। তিনি এক জন শাস্ত্রের অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন। বিচারতঃ তাঁহাকে এক জন হিন্দুশাস্ত্রীয় দর্শন-কার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তিনি বেদ ও অন্যান্য সমুদয় শাস্ত্রের যথাযোগ্য মান্য রাখিয়া শাস্ত্রের এক চমৎকার সংক্ষেপ মীমাংসা আমারদিগকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এইক্ষণে ইওরোপীয় দর্শন-কারদিগের শ্রেণীর অনেক গ্রন্থকার এ দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু রামমোহন রায় যে শ্রেণীর দর্শনকার ছিলেন, বোধ হয় শাস্ত্র-প্রিয় ভারত-রাজ্য তাঁহার অর্ণবপোতারোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে চিরকালের

* এই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি শ্রীযুত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বিজ্ঞবর শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় উহা এবং রামমোহন রায়ের কতিপয় অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থ পুনঃ মুদ্রিত করিয়া দেশের উপকার করিয়াছেন।

নিমিত্তে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি যে সহজ প্রণালীতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা যেমন শাস্ত্রানুমোদিত, তেমনি হৃদয়-গ্রাহী।

১৮৯। রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় যে বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য এবং বেদান্তসার নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা শঙ্কর-ভাষ্যেরই অনুযায়ী। তাহাতে তিনি স্বীয় অভিপ্রায় কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু নানা গ্রন্থের ভূমিকায় ও শাস্ত্রীয় বিচার-গ্রন্থসমূহে তিনি অনেক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ সকল অভিপ্রায়ের মধ্যে আমরা শাস্ত্র ও ব্রহ্ম-বিচারের প্রাগুক্ত সহজ প্রণালী দেখিতে পাই।

১৯০।. প্রথমতঃ। কতিপয় শ্রুতি-পাঠে আপাততঃ এমত বোধ হইতে পারে, যেন ব্রহ্মই জগৎ ও জীবাত্মা হইয়াছেন। আর কতিপয় শ্রুতি-পাঠে ব্রহ্ম, জগৎ ও জীবাত্মাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বোধ হয়। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এবং পাতঞ্জল শাস্ত্রও দ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শারীরক-সূত্রের মধ্যেও গূঢ়ভাবে অদ্বৈত-মিশ্রিত দ্বৈত-বাদই বিরাজ করিতেছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে প্রণালীতে শারীরক-ভাষ্য করিয়াছেন তৎপাঠে সহসা বোধ হয়, যেন পরমাত্মা ভিন্ন মানবের স্বতন্ত্র কোন জীবাত্মা নাই। তবে যে জীবাত্মা নামটি শুনিতে পাওয়া যায় তাহা যেন নামমাত্র অর্থাৎ কেবল একটি উপাধি। সুতরাং সে একটি যেন মিথ্যা সংজ্ঞার ন্যায় আপাততঃ বোধ হয়। অপর, উক্ত ভাষ্যে জগৎও যেন একটি ভোজ-বাজীর ন্যায় মিছা মায়া হইয়া আছে। শঙ্কর-ভাষ্যের এরূপ ভাবের গূঢ় অর্থ যে অতি মনোহর তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু

শঙ্কর-ভাষ্যের বা অদ্বৈত-প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের তাদৃশ গূঢ় অর্থ কোন ব্যাখ্যাকার স্পষ্ট করিয়া না বলায় ভারতবর্ষ অভিলষিত ফল-লাভ করিতে পারেন নাই।

১৯১। রামমোহন রায় একটি অতি সহজ ও সুসংলগ্ন প্রণালী দ্বারা ঐ সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন। তিনি মীমাংসা করিলেন যে, ব্রহ্ম, জীব ও জগতের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। ভেদই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। উপনিষদে যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" কহিয়াছেন, সে, ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপ্তিত্ব-প্রতিপাদনার্থে। নানা দেবতাকে যে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সে, ব্রহ্মের সর্ব্বত্রে বর্ত্তমানতা দেখাইবার জন্য এবং দুর্ব্বলাধিকারীর হিতের নিমিত্তে। প্রত্যেক পদার্থে বা দেবতাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বামদেব, কপিল, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মারা যে, আপনা আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, "অধ্যাত্ম-বিদ্যার উপদেশ-কালে বক্তারা আত্মতত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা-স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন।" ফলে তাঁহারা যে আপনারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রহ্ম, ও বর্ণনার এমত তাৎপর্য্য নহে। রামমোহন রায়ের এইরূপ ব্যাখ্যায় স্থির হইয়াছে যে, জীবাত্মাকে, কোন মনুষ্যকে বা কোন পদার্থকে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলা অদ্বৈত-প্রতিপাদক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে।

১৯২। দ্বিতীয়তঃ। যদিও ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণ গৃহস্থই ছিলেন; কিন্তু পশ্চাৎকালে সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হওয়ায় তদবধি সকলেরই এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, গৃহে থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা করা যায় না। রামমোহন রায় শ্রুতি, স্মৃতি, গীতা

প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা ঐ সংস্কার দূর করিয়াছেন। ইহাতে এ দেশের অনেক ভদ্রলোক গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে উপনিষৎ ও বেদান্ত-দর্শনের বিস্তর জ্ঞান-লাভ করিয়াছেন এবং অনেকে ব্রহ্মোপাসক হইয়াছেন। ঈশ্বর-নিয়মিত গৃহস্থ-ধর্ম্ম এবং উচ্চাধিকারীদিগের উন্নত-আশা এ দুই তদ্দ্বারা যুগপৎ চরিতার্থ হইতেছে। এই প্রণালীর নিমিত্তে আমরা রামমোহন রায়ের নিকটেই বিশেষরূপে ঋণী আছি।

১৯৩। এই বর্ত্তমান কালে যাঁহারা শাস্ত্র না মানিয়া কেবল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করত পরমার্থ-তত্ত্বের বিচার করিতেছেন তাঁহারদিগের বিচার-প্রণালীকে উৎকৃষ্ট বলা যায় না, কেন না, শাস্ত্রের প্রমাণ ব্যতীত যুক্তি অতি দুর্ব্বল; বিশেষ সহস্র সহস্র বর্ষের শাস্ত্ররূপ পরীক্ষিত বৃত্তান্তের উপরিই যুক্তি সফলতা সহকারে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু রামমোহন রায়ের বিচার-প্রণালী একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। তিনি ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি স্থিরতর রাখিয়া—শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েরই যথাযোগ্য মর্য্যাদা রাখিয়াছেন।

১৯৪। রামমোহন রায়ের মত বিষয়ে কতিপয় সূত্র ও তৎপোষকতায় তাঁহার স্বীয় বাক্যের সারভাগ-সমূহ নিম্নে প্রদান করিতেছি। তিনি যে কিরূপ সহজ, যুক্তিযুক্ত ও সুন্দর প্রণালীতে শাস্ত্রের বিচার করিতেন, তাহার আভাসও তাহা হইতে পাওয়া যাইবেক।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের কৃত মীমাংসা।

বিশ্বাস, যুক্তি ও শাস্ত্র।

১। পারমার্থিক জ্ঞান-লাভে বিশ্বাস, শাস্ত্র ও যুক্তি এই তিনের সামঞ্জস্য প্রয়োজন।

১৯৫। "পারমার্থিক জ্ঞানান্বেষণে আমরা সর্ব্বদা অনেক প্রকার বাধার অধীন হইয়া পড়ি। প্রাচীন জাতিদিগের শাস্ত্র সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে তৎসমূহের পরস্পর অনৈক্য দেখা যায়। তাহাতে নিরাশ হইয়া যখন আমরা অভ্রান্ত গুরুজ্ঞানে যুক্তির শরণাপন্ন হই তখন অবিলম্বেই বুঝিতে পারি আমারদিগকে গম্য-স্থানে উত্তীর্ণ করিবার পক্ষে একাকী যুক্তি নিতান্তই অপটু। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, যুক্তি আমারদের যত্নকে সহজ না করিয়া অথবা আমারদের অজ্ঞানতা দূর না করিয়া কেবলই এমন অপার সন্দেহ উৎপন্ন করে যাহা আমারদের সুখ শান্তির বিরোধী হইয়া উঠে। বোধ হয় শাস্ত্র অথবা যুক্তি উভয়ের মধ্যে একাকী কাহাকেও অবলম্বন করা উচিত নহে। কিন্তু উভয় হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহারই ন্যায্য ব্যবহার দ্বারা আমারদের মানসিক ও ধর্ম্ম বৃত্তি সমূহকে উন্নত করা কর্ত্তব্য। আর সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস রাখা কর্ত্তব্য, কারণ যাহা আমরা দৃঢ়তা ও যত্ন সহকারে প্রার্থনা করি, কেবল ঐরূপ বিশ্বাসই আমারদিগকে তাহা পাইবার অধিকার দেয়"।*

---

* ইংরাজী কেনোপনিষদের ভূমিকা (খৃঃ অঃ ১৮১৬) হইতে অনুবাদিত।

২। বেদ পরমেশ্বরের তুল্য নিত্য নহে।

১৯৬। "বেদে কহেন 'বাচা বিরূপনিত্যয়া' নিত্যে বাক্য বেদ হয়েন। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বেদকে (ব্রহ্মের তুল্য) স্বতন্ত্র নিত্য কহিতে পারি না। কারণ এই যে, শ্রুতিতে বেদের জন্ম পুনরায় শুনা যাইতেছে। 'ঋচঃসামানি জজ্ঞিরে' ঋক্ সকল ও সাম সকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এবং বেদান্তের তৃতীয় সূত্রে বেদের কারণ ব্রহ্মকে কহিয়াছেন। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' শাস্ত্র যে বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম।" * অতএব বেদ নিত্য নহে।

৩। সকল শাস্ত্রই মান্য।

১৯৭। বেদই মূল। "তবে যে বেদের তুল্য করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে গুরুতর লিখেন আর আগমে আগমকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ কহেন সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র। যেমন 'ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং' অর্থাৎ যেমন প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন যে, এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন।"† "পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন।"‡

অধিকার।

৪। চরিত্র পবিত্র হইলেই ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার হয়।

১৯৮। "শাস্ত্রে কহেন যথাবিধি চিত্ত-শুদ্ধি হইলেই

* রাঃ মোঃ রাঃ কৃত বেদান্তসার।
† গোস্বামীজীর পত্রের উত্তরে ৯ পৃ ১২২৫ বঙ্গাব্দ ২ আষাঢ়।
‡ ঈশোপনিষদের ভূমিকা।

ব্রহ্ম-জ্ঞানের ইচ্ছা হয়; অতএব ব্রহ্ম-জ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে, চিত্ত-শুদ্ধি ইহার হইয়াছে।"*

"ইহার (ব্রহ্মোপাসনার) উপদেশ সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্তু যাহার যে প্রকার চিত্ত-শুদ্ধি তাহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয়।"†

৫। ব্রহ্মজ্ঞানে গৃহস্থ অধিকারী।

১৯৯। "বেদে এবং বেদান্ত-শাস্ত্রে এবং মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থের আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে।" ‡

৬। শূদ্র বেদ-শ্রবণের ও বৈদিক-জ্ঞান-আলোচনার অধিকারী।

২০০। যখন ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের নিকট বেদমন্ত্র-বিশিষ্ট শ্রাদ্ধের মন্ত্রাদি পাঠ করান এবং মহাভারত যে পঞ্চম বেদ তাহা শূদ্রকে শুনান এবং শূদ্রেরা তাহার আলাপ পরস্পর করেন, তখন শূদ্রদিগের বেদ বেদান্ত শ্রবণের বা আলোচনার আর অবশিষ্ট কি আছে?¶

উপাসনা।

৭। ব্রহ্মোপাসনাই প্রধান।

২০১। "উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর একমাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আমারদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হন তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়।" §

---

* ঈশোপনিষদের ভূমিকা ৯ পৃ। † অবতরণিকা ১৭৫১ শক।

‡ ঐ ৬পৃ ১৭৮৩ শক।

¶ বেদান্ত-সূত্রের ভূমিকা হইতে সংক্ষেপ-কৃত।

§ ঈশোপনিষদের ভূমিকা।

২০২। "এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয়-দমনে ও প্রণব, উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। আমারদের অভ্যাস-সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না; অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তা করিবেন। সত্যের অবলম্বন করিবেন।" *

৮। ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব নহে।

২০৩। "ব্রহ্ম-জ্ঞান যদি অসম্ভব হইত তবে 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ'। 'আত্মেবোপাসীত'। এই-রূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞান-সাধনের প্রেরণা থাকিত না, কেন না, অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা শাস্ত্রে হইতে পারে না।"†

৯। পিতা, পিতামহ ব্রহ্মোপাসনা করেন নাই বলিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে বঞ্চিত থাকা সদসৎ-বিবেচনা-বিশিষ্ট মানবের কর্ত্তব্য নহে।

২০৪। "মনুষ্য যাহার সৎ অসৎ বিবেচনার বুদ্ধি আছে, সে কিরূপে ক্রিয়ার দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়া, স্ববর্গে করেন, এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পারমার্থ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে? এই মত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে হইলে পর পৃথক্ পৃথক্ মত এ পর্য্যন্ত হইত না।" ‡

---

* অবতরণিকা ৫পৃ। ১৭৫১শক।
† ঈশোপঃ ভূমিকাঃ ৪ পৃ।
‡ বেদান্তঃ সূঃ ভূমিকা।

১০। দেব দবীর উপাসনা কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর মনস্থিরের নিমিত্ত।

২০৫। "পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনি পুনঃ পুনঃ এই রূপে করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপ-কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক। পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রমাণ— স্মার্ত্ত-ধৃত যমদগ্নির বচন। 'চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা-শরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা। রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা।' জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপাধি-শূন্য, শরীর-রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। রূপ-কল্পনা স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব, স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়। * * * * * 'এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানিচ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং।' এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্প-বুদ্ধি ভক্তদের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে। অতএব বেদ, পুরাণ তন্ত্রাদিতে যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্ব্বলাধিকারীর নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে এই রূপ শত শত মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন।"*

---

* ঈশোপঃ ভূমিকা। শক ১৭৩৮ আষাঢ়।

"প্রায়শঃ আমারদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে, কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এ সকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্ব-সাক্ষী, সদ্রূপ পরব্রহ্মের প্রতি চিত্ত-নিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন; আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাঁহারদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম।" *

ব্যবহার।

১১। সুখ-দুঃখ-বোধ ব্রহ্মোপাসনার অন্তরায় নহে।

২০৬। "ব্রহ্মোপাসনা করিলে ভদ্রাভদ্র, দুর্গন্ধ সুগন্ধ, আর অগ্নি জলের পৃথক্ জ্ঞান থাকে না। এরূপ বাক্য অপ্রমাণ। যেহেতু 'নারদ, সনৎকুমারাদি, শুক, বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন; অথচ ইহাঁরা অগ্নিকে অগ্নি, জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্য-কর্ম্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিষ্য সকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন।"†

১২। ব্রহ্মোপাসনার কেহ বিরোধী নাই ও ব্রহ্মোপাসক অন্যান্য উপাসকের বিরোধী নহেন।

২০৭। "ব্রহ্মোপাসক যে পরমেশ্বরকে নিরাকার ভাবিয়া উপাসনা করেন অন্যান্য উপাসকেরা তাঁহাকেই সাকার ভাবিয়া উপাসনা করেন সুতরাং কেবল রুচি ও অধিকারের প্রভেদ ভিন্ন কোন বিরোধ নাই।"‡

---

* বেদান্ত-ভাষ্যের ভূমিকা। ১৭৩৭ শক।

† বেদান্ত-ভাষ্যের ভূমিকা।

‡ অনুষ্ঠান—অবতরণিকা হইতে ভাব সংগ্রহ। (১৭৫১ শক)।

১৩। শাস্ত্রানুসারে আহার ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত।

২০৮। "কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে করে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়। * * * * বাস্তবিক বিদ্যা ও পরমার্থ-চর্চ্চা না করিয়া সর্ব্বদা আহারের উত্তমতা ও অধমতার বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত।" *

২০৯। "যদ্যপিও বেদে কহেন 'এবংবিন্নিখিলং ভক্ষয়তি'. (ছা) জ্ঞানী সমুদয় বস্তু খাইবেন অর্থাৎ কি অন্ন কাহার অন্ন এমত বিচার করিবেন না; তত্রাপি 'সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ' (বেঃ সূঃ ৩।৪।২৮) সর্ব্বপ্রকারের অন্নাহারের বিধি জ্ঞানীকে আপৎকালে আছে।"†

১৪। জ্ঞানাভ্যাসই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত।

২১০। "জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্মই জীবাত্মার আশ্রয় এইরূপ চিন্তা) একবার করিলেও সর্ব্ব পাপ ক্ষয় পূর্ব্বক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"‡ "পাপকে জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা দগ্ধ করিবে, তাহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই।"¶ ব্রহ্মেতে সমস্ত অর্পণ, ইন্দ্রিয় সংযম, আত্মাতে মন স্থির, তপস্যা, বেদার্থের জ্ঞান-সাধন, চিত্তবৃত্তি-সংযম এই সকল যজ্ঞস্বরূপ, ইহার আচরণ দ্বারা অধিকারীবিশেষে পাপ-ক্ষয় হয়।§

২১১। "যদ্যপিও ইন্দ্রিয়-দমনে যত্নবান্ পুরুষের কদাচিৎ স্খলন হয় তবে তাহার শান্তির নিমিত্ত মনস্তাপ-

---

* অনুষ্ঠান—অবতরণিকা হইতে ভাব সংগ্রহ। (১৭৫১ শক)।

† রাঃ মোঃ রাঃ বেদান্তসার।

‡ পথ্য প্রদান ৮৫ পৃ (১৭৪৫ শক)।

¶ পথ্য প্রঃ ৮৬পৃঃ।

§ পথ্য প্রঃ হইতে সংক্ষেপকৃত। ২৫। ২৬। পৃঃ ১৭৪৫ শকের ছাপা।

পূর্ব্বক দৃঢ় যত্ন করিবেন যে, পুনরায় সেরূপ কর্ম্ম তাঁহা হইতে না হয় (মনুঃ) 'অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতং। তস্মাৎ বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ।' "*

ব্রহ্ম।

১৫। ব্রহ্ম স্বয়ং কিছুই হন নাই।

২১২। বেদে অনেক স্থলে দেবতা, দেবতার বাহন, মনুষ্য, আকাশ, মন, অন্ন, ইত্যাদি নানা বস্তুকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন আছে। "এসকলকে ব্রহ্ম কথনের তাৎপর্য্য বেদের এই হয় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বময় (সর্ব্বব্যাপী) হয়েন * * পৃথক্ পৃথক্কে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য্য নহে। এইমত সিদ্ধান্ত বেদ আপনি অনেক স্থলে করিয়াছেন।"†

১৬। সকলই ব্রহ্ম, শাস্ত্রের এরূপ বাক্য ব্রহ্মের সর্ব্ব-ব্যাপ্তিত্ব-প্রতিপাদক। পরিণাম-প্রতিপাদক নহে।

২১৩। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "তদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" অর্থাৎ যাবৎ সংসার ব্রহ্মময় হয়েন। "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ব্রহ্ম সকল গন্ধ ও সকল রস হয়েন। অতএব নানা বস্তুকে এবং নানা দেবতাকে ব্রহ্মত্ব আরোপণ করিয়া ব্রহ্ম কহিবাতে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপ্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। নানা বস্তুর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না। সকল দেবতার

---

* রামচন্দ্র শর্ম্ম কর্তৃক ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বিতীয় ব্যাখ্যান ১৩ ভাদ্রে ১৭৫০ শক পৃঃ ৯। রামচন্দ্রশর্ম্মা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন।

† বেদান্ত ভাষ্যের ভূমিকা।

এবং সকল বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়। এবং এই জগতের স্রষ্টা অনেককে মানিতে হয়। ইহা বুদ্ধির এবং বেদের বিরুদ্ধ মত হয়।"*

১৭ জীব বা জগৎ ব্রহ্ম নহে।

২১৪। "দেহ এবং দেহের আধেয় (অর্থাৎ জীবাত্মা) এই দুই হইতে ভিন্ন যে পরব্রহ্ম তেঁহ নানা প্রকার হয়েন না। * * * শ্রুতি 'একমেবাদ্বিতীয়ং' অর্থাৎ ব্রহ্ম একই, অন্য যাহা কিছু আছে তিনি তাহা নহেন।* এই শ্রুতির অর্থ এই যে, তাঁহার স্বজাতীয় দ্বিতীয় কেহ নাই। অর্থাৎ দুই ব্রহ্ম নাই। সেই স্বজাতীয় দ্বিতীয়ের নিরাস "এক, এব, অদ্বিতীয় এই তিন শব্দ দ্বারা করিয়াছেন।"†

১৮। তুমি বা আমি ব্রহ্ম নহি।

২১৫। "'তত্ত্বমসি' (সেই পরমাত্মা তুমি।) 'তন্বা অহমস্মি ইত্যাদি' হে ভগবন্ যে তুমি সেই আমি হই * * ইত্যাদি বাক্যের অধিকারী সকলেই হয়েন। এ নিমিত্তে তাঁহারদিগকে জগতের স্বতন্ত্র কারণ এবং উপাস্য করিয়া স্বীকার করা যায় না।"‡ "অধ্যাত্ম-বিদ্যার উপদেশ কালে বক্তারা আত্ম-তত্ত্ব-ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা-স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন, অথচ তাঁহারদের উপাধি-সম্বন্ধাধীন পুনরায় স্থানে স্থানে ভেদ প্রদর্শন বিশেষণাক্রান্ত করিয়াও আপনাকে কহেন। অর্থাৎ পরমাত্মাকে অন্যরূপে উপদেশ আর আপনাকে স্বতন্ত্র বিশেষণাক্রান্ত রূপে বর্ণন করেন; অতএব অধ্যাত্ম-উপদেশে

* বেদান্তসার-রাঃ মোঃ রাঃ।
† রামচন্দ্রশর্ম্ম কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান ৩০ ভদ্রে ১৭৫০।
‡ বেদান্তসার রাঃ মোঃ রাঃ।

পরমাত্মাস্বরূপে বক্তার যে কথন, তাহার দ্বারা সেই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ তাৎপর্য্য না হইয়া পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হয়েন। ইহার মীমাংসা বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে ৩০ সূত্রে করিয়াছেন।" *

১৯। পরমেশ্বর নিরাকার। যাহার রূপ আছে বা ছিল তাহা ব্রহ্ম নহে।

২১৬। "যে বস্তু সাকার সে নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, ব্রহ্মস্বরূপ কদাপি হইতে পারে না" যদি বল ব্রহ্মের "আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার আছে, কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টি-গোচর হয়।† ইহার উত্তর। * * * আনন্দের হস্ত পদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের এবং দয়ার অবয়ব এ সকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে কিন্তু তাহা যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হয়" এবং ইহা "শ্রুতি, স্মৃতি এবং অনুভব ও প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ।"‡

মায়া।

২০। ঈশ্বরের সৃষ্টি-শক্তিই মায়া নামে প্রসিদ্ধ।

২১৭। "নিত্য পরমেশ্বরের সৃষ্টি-শক্তিই মায়া। সুতরাং উহা বেদান্তে নিত্য বলিয়াই কথিত হইয়াছে। মায়ার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাহি। উহা ঈশ্বরেরই শক্তি এবং স্বধর্ম্ম দ্বারা

---

* পথ্য প্রদান। ১৭৪৫ শক ১০৮ পৃ।

† বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবেরা এইরূপ কহেন।

‡ গোস্বামীজীর পত্রোত্তরে ৩১ পৃঃ ১২২৫। ২ আষাঢ়।

পরিচিত হয়। ঠিক সেই প্রকার যেমন উত্তাপ অগ্নির শক্তি এবং তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাহি। তথাপি তাহার ধর্ম্ম অনুভব করা যায়।* পরমেশ্বরের এই শক্তি কর্ত্তৃক জড় জগৎ ও জীবসকল সৃষ্ট হয় (অর্থাৎ পরমেশ্বরই সৃষ্টি করেন)। সেই জীবাত্মাসকল পুণ্য ও পাপ করিয়া থাকে এবং তাহার ফলভোগ করে। ফলে যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি-শক্তির সহিত তাহারদের সম্বন্ধ তিরোহিত হয় তবে তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইবে।"†

উপসংহার।

২১৮। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না অথচ পারমার্থ-তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য বেদান্ত-বিজ্ঞান আলোচনা করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারদিগের ইতিহাস শিক্ষা করার ন্যায় কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ও বেদাঙ্গ সমূহের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংবাদ জানা কর্ত্তব্য এবং দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদের অর্থসকল ধারণ করা উচিত। উপনিষদ্ পাঠে যত সন্দেহ উপস্থিত হইবেক বেদান্ত-সূত্র পড়িলেই তাহার অধিকাংশ মীমাংসা হইয়া যাইবেক। কিন্তু যদি ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল ও পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের স্থূলস্থূল বিবরণ গুলি ইতিহাসের ন্যায় জানা থাকে তবে বেদান্ত-সূত্রের অর্থ বুঝিবার পক্ষে অধিক সুবিধা হয়। কেন না, বেদান্ত-সূত্রের মধ্যে ঐ সকল দর্শনের অনেক ভাব প্রসঙ্গাধীন

---

* Translated from a Foot-Note in the Brahminical magazine 1821.

† For particulars see the said magazine p. p. 13 to 15.

উত্থাপিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত রামমোহন রায়ের বেদান্ত-ভাষ্য, তাঁহার বেদান্ত-সার, তাঁহার প্রকাশিত নানা উপনিষদের ভূমিকা ও তাঁহার বিচার-গ্রন্থসকল শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলে বেদান্ত-সূত্রের মর্ম্মাবধারণে বিশেষ পটুতা জন্মে।

২১৯। বর্ত্তমান সময়ে বেদান্ত-পাঠীরা অনেকে পরমহংস পরিব্রাজক সদানন্দ যোগীন্দ্র-প্রণীত বেদান্তসার ও ভারতী-তীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বর-কৃত পঞ্চদশী প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করেন। বস্তুতঃ যে পর্য্যন্ত উপনিষৎ ও শঙ্করভাষ্যের সহিত শারীরক মীমাংসার তাৎপর্য্য অবগত না হইবেন তত দিন তাঁহারা বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত থাকিবেন এবং তাঁহারদের নিকটে বেদান্তসার পঞ্চদশী ও গীতা প্রভৃতির প্রকৃত তাৎপর্য্য স্ফূর্ত্তি পাইবে না। বরং মীমাংসার অভাবে ঐ সকল শাস্ত্র দ্বারা তাঁহারদের মন অনেক প্রকার কল্পনা ও ভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেক।

২২০। অতএব ব্রহ্ম লইয়া যাঁহারদের ব্যবসা তাঁহারদের উচিত উপরি উক্ত উপায়ে উপনিষদের সহিত বেদান্ত-সূত্র ও তদ্ভাষ্য অধ্যয়ন করেন। তাহাতে মুখ্য কল্পে তাঁহারদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবেক এবং গৌণকল্পে তাঁহারদিগের দ্বারা ভারতের গৌরব ও শাস্ত্র সকল রক্ষা হইয়া ভারতীয় সারবান্ ব্রহ্ম-জ্ঞান পুরুষ-পরম্পরা প্রবাহিত হইতে থাকিবেক। পর-মার্থ-জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগকে বেদান্ত-পাঠে উৎসাহ ও সাহায্য দিবার নিমিত্তে আমার এই নিবেদন।

সমাপ্ত।

অতিরিক্ত পত্র।

(ক)

১৮ ক্রম হইতে।

পাণিনি।

১। দক্ষিণাপথে গোনর্দ্দদেশে মহর্ষি পাণিনির নিবাস ছিল। তৎকৃত পাণিনি-সূত্র অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত। ঐ দেশ-নিবাসী মহর্ষি পতঞ্জলি তাহার ভাষ্য করেন। এই মহর্ষি পতঞ্জলিই পাতঞ্জল-দর্শনের সূত্রকার এবং নিদান-সূত্রের ভাষ্য-কার ছিলেন। পতঞ্জলির পাণিনি-ভাষ্যের দুই টীকা। মহা-রাজা ভর্ত্তৃহরির কারিকা এক টীকা; এবং কাশ্মীর-নিবাসী জৈয়-টের পুত্র ও প্রসিদ্ধ-নৈষধকাব্য-প্রণেতা শ্রীহর্ষদেবের সহোদর কৈয়ট-কৃত দ্বিতীয় টীকা। নাগোজী ভট্ট কৈয়টের টীকার উপরি এক বিবরণ প্রস্তুত করেন এবং "পরিভাষা-ইন্দুশেখর" নামে এক খানি স্বতন্ত্র ব্যাকরণও রচনা করেন। নাগোজীভট্ট স্বীয় মঞ্জুষা নামক গ্রন্থে স্ফোটের বিবরণ বাহুল্যরূপে প্রদান করিয়া-ছেন। নাগোজীভট্টের আর এক নাম নাগেশ। পাণিনি-সূত্রের মূলানুযায়ী আর এক খানি বিস্তীর্ণ ব্যাকরণ আছে; তাহার নাম সিদ্ধান্ত-কৌমুদী। তাহার শ্লোক-সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র। ভট্টজী দীক্ষিত এই গ্রন্থ তাহার মনোরমা নামক টীকা এবং পাতঞ্জল-ভাষ্যের ছায়াস্বরূপ শব্দ-কৌস্তুভ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। দক্ষিণাপথে তাঁহার আদি নিবাস ছিল, পশ্চাৎ

তিনি কাশীক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন। দক্ষিণদেশ-নিবাসী হরিদীক্ষিত "শব্দরত্ন" নামে ভট্টজী-কৃত "মনোরমার" এক টীকা করেন এবং উপরিউক্ত নাগোজীভট্ট "মনোরমাকে" খণ্ডনপূর্ব্বক "শব্দেন্দুশেখর" প্রকাশ করেন। অপর, ভট্টজীদীক্ষিত ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণ মতে "বৈয়াকরণভূষণ" নামে এক সুন্দর সংগ্রহ প্রস্তুত করেন তাহাতে স্ফোটের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে এই সকল শাস্ত্রের অধ্যাপনা নাই। বারাণসী, দাক্ষিণাত্য, মিথিলা প্রভৃতি দেশে এই সকল শাস্ত্রের বহুল অনুশীলন আছে। এই সমগ্র শাস্ত্রই পাণিনি-সূত্রের শাখা প্রশাখা। সুতরাং সাধারণতঃ পাণিনি নামেই প্রসিদ্ধ। পাণিনি-পাঠের বিবিধ ফল। প্রথমতঃ চারিবেদ ও শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন শাস্ত্র স্বাধ্যায়ের মধ্যে পরিগণিত হয় এবং যাহা পূর্ব্বকালে ষট্‌ত্রিংশৎবর্ষ গুরুকুলে বাস করিয়া অধ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে কেবল এক মাত্র পাণিনিই এইক্ষণে প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং পাণিনি-পাঠের দ্বারা স্বাধ্যায়ের আংশিক ফল-লাভ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ পাণিনি হইতে যে পরিমাণ ব্যাকরণের জ্ঞান-লাভ হয় অন্য কোন ব্যাকরণ হইতে তাহা হয় না। তৃতীয়তঃ পাণিনি উপমাচ্ছলে অপর্য্যাপ্ত বৈদিক-জ্ঞান প্রদান করেন। চতুর্থতঃ পাণিনি কেবলই ব্যাকরণ নহে, উহা এক খানি চমৎকার দর্শন-শাস্ত্রবিশেষ। উহার বিচার হইতে মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান এই তিনই লাভ হইয়া থাকে।

২। পাণিনির মতে শব্দের দুই প্রকার প্রকৃতি, বর্ণাত্মক এবং স্ফোট। বর্ণ এবং তাহার উচ্চারণ যে ধ্বনি এ উভয়ই

অনিত্য। বর্ণ এবং ধ্বনি স্থূল-প্রকৃতি-বিশিষ্ট। কিন্তু শব্দের যে অর্থ তাহা নিরাকার এবং সূক্ষ্ম। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-হীন যে ভাবার্থ তাহাতেই মানবের প্রয়োজন। বর্ণাত্মক শব্দ তাহাই ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপিত উপায় স্বরূপ। এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যকে আপনার মনের ভাব জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছা করিলে প্রচলিত বর্ণাত্মক বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বারা তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞাতব্য যে মনোভাব তাহা বক্তা হইতে শ্রোতাতে নিরাকার ভাবে প্রবেশ করে। সেই নিরাকার ভাব বহন করিয়া দিবার নিমিত্তে শব্দ কেবল পার্থিব, সর্ব্ববাদী-সম্মত উপায় মাত্র, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাদৃশ নিরাকার ভাব শব্দ হইতে নির্লিপ্তই আছে। এইরূপে প্রত্যেক শব্দ ও সুতরাং শব্দের বিষয় প্রত্যেক পদার্থ যখন ভাবেতে পরিণত হয় তখন সেই নিরাকার-ভাব-জ্ঞানকে স্ফোট কহে। এই জ্ঞানই নিত্য, আর বর্ণাত্মক শব্দ সমুদয় অনিত্য। এইরূপ নিরাকার ভাবই ব্রহ্ম-জ্ঞানের হেতু। সুতরাং পাণিনির মতে ঐ স্ফোটই সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম-স্বরূপ। যে বেদান্ত-শাস্ত্র সমস্ত বস্তুকে অনিত্য বলিয়া কেবল ব্রহ্মকেই এক মাত্র ধ্রুব-সত্য রূপে উপদেশ দেন, শব্দের এইরূপ অনিত্যতা-বোধ তৎপাঠের বিশেষ উপযোগী। "বেদানাং বেদ ইতি ছন্দোগশ্রুতিরেতৎপরৈব শ্রুতিমূলকত্বাৎ অস্যৈব বেদাঙ্গত্বং।" ইতি নাগোজীভট্টধৃত শ্রুতিঃ।

এই যে পাণিনি ব্যাকরণ ইহা বেদসমূহের বেদ-সদৃশ, সে কথা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত আছে। কেবল এই ব্যাকরণই শ্রুতিমূলক, ইহারই কেবল বেদাঙ্গত্ব। অন্যের নহে।

(খ)

২১ ক্রম হইতে।

জ্যোতিষ।

১। বেদাঙ্গীয় মূল জ্যোতিষ যে কতদূর পর্য্যন্ত উন্নত ছিল তাহা নিরূপণ করিয়া বলা যায় না। ফলে উপরি উক্ত আচার্য্যগণ ভারতীয় জ্যোতিষের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। আর্য্যভট্ট অতি প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন "ভ-পঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্ত্যাবৃত্ত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহণাম্" নক্ষত্র-মণ্ডল স্থির আছে, কেবল পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে, তাহাতেই গ্রহ-নক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত হইতেছে। ভাস্করাচার্য্য স্বকীয় গোলাধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "সপর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যচায়শ্চিতঃ। কদম্বকুসুম-গ্রন্থিকেসরপ্রসরৈরিব।" কদম্ব পুষ্পের গ্রন্থি যে প্রকার কেসর সমূহ দ্বারা বেষ্টিত থাকে তদ্রূপ পৃথিবী-পিণ্ড বন, পর্ব্বত, গ্রাম, চৈত্য দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। "নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে। নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমস্তাৎ।" বিনা আধারে পৃথিবী স্বভাবতঃ আকাশে স্থিতি করিতেছে এবং তাহার পৃষ্ঠে দেব, দৈত্য, দানব, মনুষ্য সহিত সমুদয় স্থাপিত রহিয়াছে। "মূর্ত্তোধর্ত্তা চেদ্ধরিত্র্যাস্তদন্যস্তস্যাপ্যন্যোপ্যেব মাত্রানবস্থা। অন্তে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যা কিম্নো ভূমেঃ সাষ্টমূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ।" যদি এমন মনে কর যে এই পৃথিবীর মূর্ত্তিমান আধার

আছে; তথাপি সেই আধারের আশ্রয় জন্য পুনর্ব্বার অন্য আধার আবশ্যক, এবং সেই দ্বিতীয় আধারের ধারণ জন্য তৃতীয় এক আধারের আবশ্যক হয়। এই প্রকারে আধারের আর শেষ হয় না। অতএব যদি অবশেষে এমত এক আধারের কল্পনা করিতে হইল, যে স্বীয় শক্তি দ্বারা শূন্যে স্থিতি করিতে পারে; তবে প্রথম যে পৃথিবী, তাহারই এমত শক্তি কেন না স্বীকার কর? পৃথিবী মূর্ত্তিমান্ অষ্ট গ্রহের মধ্যে এক গ্রহ বিশেষ। সুতরাং অপরাপর গ্রহ যখন আকাশে স্থিতি করিতেছে ইহাও সেইরূপ করিতেছে। "তরণিকিরণসঙ্গাদেষপীযূষপিণ্ডঃ, দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি। তদিতরদিশি বালা-কুন্তল-শ্যামলশ্রির্ঘটইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ।" সূর্য্য-কিরণ প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যাভিমুখে স্থিতি করে সেই অংশ প্রকাশ পায়, তদ্ভিন্ন অপরাংশ বালা স্ত্রীর কেশের ন্যায় শ্যামবর্ণ থাকে—যে প্রকার রৌদ্র-স্থিত ঘটের আপন ছায়া দ্বারাই তাহার এক পার্শ্ব অপ্রকাশ থাকে।* পুরাণে পৃথিবীর আধারের নিমিত্তে বাসুকী ও কূর্ম্মকে যে পরে পরে স্বীকার করিয়াছেন তাহার অর্থ অন্য রূপ। কিন্তু জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান জ্যোতিষ-শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিতে হইবেক। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদান্তের সহিত জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের সংশ্রব নাই কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে পৌরাণিক কল্পনার পরিবর্ত্তে সত্য-জ্যোতিষ-বিজ্ঞান জানিয়া রাখাই উচিত।

* এই সমুদয় বচন প্রাচীন তত্ত্ববোধিনী হইতে সংগৃহীত।

(গ)

৩৬ ক্রম হইতে।

ন্যায়।

শ্রীমান্ বাৎস্যায়ন গৌতম-সূত্রের ভাষ্য করিয়াছিলেন। মিথিলান্তর্গত মকরন্দ-বাসী ভগবান্ বাচস্পতি মিশ্র উক্ত ভাষ্যের বার্ত্তিকের টীকা করেন। বাচস্পতি মিশ্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ষড়্দর্শনের টীকা এবং দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তর শাস্ত্র লেখেন। ইহাঁর পরে মিথিলা-প্রদেশস্থ করিবন-গ্রামবাসী শ্রীমান্ উদয়নাচার্য্য ন্যায়-কুসুমাঞ্জলী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন। উক্ত পুস্তকে তিনি ন্যায়-শাস্ত্রের সহিত বিবিধ মতের বিচার করত নাস্তিক প্রভৃতি বাদীদিগকে পরাস্ত পূর্ব্বক গ্রন্থ খানি জনসমাজকে কুসুমাঞ্জলী স্বরূপ উপহার দিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য ন্যায়-শাস্ত্রীয় কিরণাবলী, বৌদ্ধাধিকার প্রভৃতি আরো কতিপয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বৌদ্ধাধিকার-গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধ মত খণ্ডন পূর্ব্বক ন্যায়ানুযায়ী তত্ত্বজ্ঞান স্থাপন করিয়াছেন। এই পুস্তক গুলি এখন প্রাচীন ন্যায়-শাস্ত্র বলিয়া গণ্য। তাহার বহুল অধ্যয়ন অধ্যাপনা হয় না এবং সকল সুপ্রাপ্যও নহে। প্রায় পাঁচশত বর্ষ হইল মহাত্মা গঙ্গেশ উপাধ্যায় নামে সুপ্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত মিথিলাতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি খণ্ড বিশিষ্ট চিন্তামণি নামে এক বৃহৎ ন্যায়-গ্রন্থ প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহা শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাহার পর ন্যায়-শাস্ত্রের যত গ্রন্থ বৃদ্ধি

হইয়াছে ঐ চিন্তামণিই সকলের মূল। জগৎ-বিখ্যাত মহাত্মা পক্ষধর মিশ্র* "আলোক" নামে চিন্তামণির এক টীকা করেন। ইনিও মৈথিলী। দ্বারভাঙ্গার ৮ ক্রোশ দূরে সর্ষপ নামক গ্রামে ইহাঁর বাস ছিল। সেখানে এখনও তাঁহার বংশ রহিয়াছে। ইহাঁর বংশে অনেক বড় বড় পণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবের পর গোকুলনাথ উপাধ্যায় আবির্ভূত হন। তিনি শব্দখণ্ডের বিবরণ স্বরূপ "পদবাক্যরত্নাকর" নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাঁহার পরে মিথিলায় ন্যায়-শাস্ত্রের আর কোন গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করেন নাই। যখন মিথিলায় ন্যায়-শাস্ত্র-পাঠের সমারোহ ছিল তখন নানা রাজ্য হইতে বিদ্যার্থীরা মিথিলায় আসিয়া পড়িতেন। বঙ্গ, বারেন্দ্র, রাঢ়, প্রভৃতি নানা অঞ্চলের ছাত্রেরা বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক মিথিলায় পড়িতে আসিতেন। বড় বড় নৈয়ায়িক হইয়া গৃহে যাইতেন। পক্ষধরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া মিথিলাতেই ন্যায়-শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে মিথিলায় রীতি ছিল অন্যত্রের ছাত্রেরা, কোন গ্রন্থ লইয়া দেশে যাইতে পাইতেন না। কিন্তু সার্ব্বভৌম এমনি শ্রুতিধর ছিলেন যে, দেশে গিয়া স্মরণ পূর্ব্বক স্বীয় অধীত গ্রন্থ লিপি করিলেন এবং শিষ্যগণকে তাহা পড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর ভুবন-বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি বঙ্গ হইতে আসিয়া পক্ষধরের নিকট বিদ্যার্থী হইলেন। তিনি সার্ব্বভৌমের ছাত্র

---

* ইহাঁর প্রকৃত নাম জয়দেব। এক পক্ষের দিন-পঞ্জিকা ইনি মুখে বলিতে পারিতেন বিধায় "পক্ষধর" নাম প্রাপ্ত হন।

থাকায় পূর্ব্ব হইতেই ন্যায়-শাস্ত্রে একরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আসিয়া দেখিলেন চতুষ্পাঠী-গৃহে পক্ষধর সোপানপরম্পরা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আপনি সর্ব্বোচ্চ সোপানে বসিয়া আছেন। ছাত্রেরা স্ব স্ব ব্যুৎপত্তি অনুসারে শ্রেণী পূর্ব্বক সোপানে সোপানে বসিয়া পড়িতেছে। রঘুনাথ উপস্থিত হইবামাত্রে পক্ষধরমিশ্র তাঁহাকে নিম্ন সোপানে বসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু রঘুনাথের শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করতঃ আশ্চর্য্যপুরঃসর তাঁহাকে নিম্নলিখিত বচনে সম্বোধন করিলেন। “সহস্রাক্ষঃ স্মৃতঃ শক্রঃ, শঙ্করস্তু ত্রিলোচনঃ, অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবান্ এক-লোচনঃ”?* এই সম্বোধনানন্তর তিনি রঘুনাথকে স্বীয় আসনে উঠাইয়া লইলেন। † রঘুনাথ কিছু দিন পক্ষধরের নিকট ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করত দেশে গিয়া চিন্তামণি গ্রন্থের “দীধিতি” নামে এক টীকা রচনা পূর্ব্বক ছাত্রদিগকে পড়াইলেন। তাহাতে নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্রের পাঠ বিশেষরূপে স্থাপিত হইল। রঘুনাথ নানাদেশীয় পণ্ডিতদিগকে এবং পক্ষধরকেও বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ প[illegible]ন্যায়ের

---

* রঘুনাথের এক চক্ষু অন্ধ ছিল।

† কিম্বদন্তী আছে যে, পক্ষধর মিশ্র রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,

“অপি দিবসমনৈষীঃ পদ্মিনীসদ্মনিস্থঃ
রজনিষু রমিতোভূঃ কৌমুদিন্যাং রমণ্যাং
কথয় কথয় ভৃঙ্গস্বচ্ছভাবেন তাবৎ
সুখমধিকমবাপ্সীরত্র বা তত্রবেতি ?”

রঘুনাথ উত্তর দেন—

“ত্বং পীয়ূষদিবোপভূষণমণির্দ্রাক্ষে পরীক্ষেতকঃ [illegible]
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোহি বিদিতং সাধ্বীচ মাধ্বী[illegible]
কিন্ত্বেকস্ত পরন্তরস্তদমপি ক্রমো নচেৎ কুপ্যসে
যঃ কান্তাধরপল্লবে মধুরিমা নান্যত্র কুত্রাপি সঃ [illegible]

চিন্তামণি গ্রন্থের "আলোক" ও "দীধিতি" নামক ঐ দুই টীকা ব্যতীত আরও এক টীকা আছে। তাহা নবদ্বীপ-নিবাসী মথুরানাথ রচনা করেন। শ্রীম[illegible] জগদীশতর্কালঙ্কার ও শ্রীমান্ গদাধর ভট্টাচার্য্য ইঁহারা প্রত্যেকে দীধিতির এক এক টীকা করেন। গদাধর [illegible] প্রভৃতি চৌষট্টীবাদ-পূর্ণ ন্যায়শাস্ত্রের কর্ত্তা। এক্ষণ নবদ্বীপে তাঁহারই গ্রন্থ সকল বহুলরূপে পাঠ হইয়া থাকে, তদতিরিক্ত রঘুনাথের, মথুরানাথের ও জগদীশের গ্রন্থসকলও অধীত হয়। কথিত আছে জগদীশতর্কালঙ্কার রঘুনাথের সঙ্গেই মিথিলায় আসিয়াছিলেন এবং গদাধর গোকুলনাথের নিকট পরীক্ষা দিতে আসেন। বোধ হয় গদাধরের পর বাঙ্গালার কোন ছাত্র আর মিথিলায় আসেন নাই। ফলে মিথিলার ছাত্রেরা যে সেই অবধিই বাঙ্গালায় ন্যায়-পাঠার্থে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এমনও নহে। তাঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত যত দূর সম্ভবে মিথিলাতেই পাঠ করিতেন। অল্প দিন পূর্ব্বেও এখানে ন্যায়-শাস্ত্রে বড় বড় অধ্যাপক ছিলেন। মহারাজ মাধব সিংহের সময়ে * সচল মিশ্র নামে এক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি মীমাংসাদর্শনেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। দিল্লীশ্বর আকবরের রাজ্যকাল হইতে মিথিলার বর্ত্তমান রাজবংশ আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে মিথিলাতে মহেশ ঠাকুর নামে এক মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। রঘুনন্দন নামে তাঁহার শিষ্য [illegible] পাঠ সমাপনানন্তর গুরুদক্ষিণা সংগ্রহাভিপ্রায়ে [illegible] সভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির

---

* [illegible]ং।

পরিচয় দিলে, বাদসাহের সন্তোষ জন্মিল। সেই সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ বাদসাহ তাঁহাকে হাটী নামে এক প্রকাণ্ড পরগণা দান করিলেন। ঐ পরগণা তৎপূর্ব্বে মহারাজা শিবসিংহের রাজ্য-ভুক্ত ছিল। শেষোক্ত মহারাজা নির্ব্বংশ হইয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভূমি-ভাগ বাদসাহের খাসে ছিল। সেই-কারণে রঘুনন্দন সহজে অত বড় খাস মহল প্রাপ্ত হইতে পারি-লেন। তিনি বাদসাহী ফরমান লইয়া আনন্দের সহিত মিথি-লাতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উহা মহেশ ঠাকুরকে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপে দান করিলেন।* মহেশ ঠাকুর পণ্ডিতাধিরাজ ছিলেন, এখন রাজা হইলেন, কিন্তু তিনি অবধি তাঁহার সমস্ত বংশ-পরম্পরা বরাবর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদর অভ্যর্থনা করিয়া আসিয়াছেন। এই বংশই এইক্ষণে দ্বারভাঙ্গার রাজবংশ এবং মিথিলাধিপতি বলিয়া উক্ত হয়। এই রাজবংশে বহু-দিনাবধি রীতি আছে যে, বিদ্যার্থীরা পাঠ সাঙ্গ করিয়া রাজ-বাটীতে সভায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। ঐ নিয়মানুসারে মিথিলার সকল পণ্ডিতই রাজানুরাগী ছিলেন। কিন্তু সচল মিশ্র তাদৃশ ছিলেন না। এক বার মহারাজ মাধব সিংহ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করায় তিনি সভাস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ তাঁহাকে দশ সহস্র রজত-মুদ্রা মাত্র সম্মান দেওয়ায় তিনি তাহা স্বীয় গুণের অযোগ্য বিবেচনায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করেন। তাহাতে রাজা তাঁহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন যে "হে পণ্ডিতবর আপনি দশ হাজার টাকা ত্যাগ করিবেন না, আপনাকে অত টাকা

* এখন এই মহলটি রাজ-দ্বারভাঙ্গার সকল পরগণা অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার সংস্থান বার্ষিক একাদশ লক্ষ টাকা এবং গবর্ণমেণ্ট-কর এক লক্ষ টাকা।

দিতে পারে এমত লোক আর নাই।” এ কথায় সচল উত্তর করিলেন “মত চাকু ত্যাগ করিতে পারে এমতও আর কেহ নাই”। ইহা বলিয়া সচল পুণ্যদেশে (পুনা সেতারা) যাত্রা করিলেন। তথাকার মহারাজা বড় সম্পত্তিশালী ও পণ্ডিত-পোষক ছিলেন। তাঁহার সভা-মণ্ডপে ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত ও ব্যাকরণের চিহ্নস্বরূপ চারিটি বর্ত্তিকা অনবরত প্রজ্বলিত থাকিত। যখন বিদেশীয় কোন্ পণ্ডিত সভারূঢ় হইয়া উক্ত চারি শাস্ত্রের কোন এক শাস্ত্রে সভাস্থ কোন পণ্ডিতকে পরাভব করিতে পারিতেন তখন সেই শাস্ত্রের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তিকাটি রাজাজ্ঞায় নির্ব্বাপিত হইত। যত দিন আর কোন বিদেশীয় পণ্ডিত ঐ সভায় ঐ শাস্ত্রে পরাভূত না হইতেন তত দিন বরিয়া উহা আর প্রজ্বলিত হইত না। সেজন্য রাজবাটী নিরানন্দময় থাকিত। সচল মিশ্র রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভূপতির নিকটে স্বীয় আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে তাঁহার সভার নিয়মানুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকা ও লোক জন পাঠাইয়া তাঁহাকে আনিলেন এবং সভা-প্রবেশ-মাত্রে সম্মানসূচক আপনি শিবিকাতে স্কন্ধ প্রদান পূর্ব্বক সচলকে অবরোহণ করাইলেন। পশ্চাৎ রজত-পাত্রে স্বহস্তে সচলের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া বিশ্রামার্থে বাস-স্থান দিবার আদেশ করিলেন। কিছু দিনে সচলের পথশ্রান্তি দূর হইলে রাজা শাস্ত্রার্থ-বিচারের দিন অবধারিত পূর্ব্বক সচলকে সভায় [illegible] হইয়া ন্যায়-শাস্ত্রের বিচারে মহা-[illegible] করিলেন। তৎক্ষণাৎ [illegible]জ্বলিত বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত [illegible]ত-মুদ্রা প্রদান করিলেন।

সচল জয়ী হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পুনর্ব্বার আর এক সময়ে পুণ্যদেশে গিয়া রাজ-সভার কোন এক পণ্ডিতকে মীমাংসা শাস্ত্রে পরাজয় পূর্ব্বক মীমাংসার [illegible] আর এক লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক লাভ করত মিথিলায় আসি-লেন। মিথিলাধিপতি মাধব সিংহ সচলের এই জয়-বার্ত্তা শ্রবণে সুখী হইলেন। এতাবতা নবদ্বীপে ন্যায়ের পাঠ সং-স্থাপিত হইলেও মিথিলায় ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ক্ষান্ত হয় নাই। দ্বারভাঙ্গার রাজবাটীতে ইতিপূর্ব্বে নৈয়ায়িক-দিগেরই অধিক সম্মান ছিল, কিন্তু চির কাল একভাবে যায় না। এক্ষণ তৎপরিবর্ত্তে ব্যাকরণের পণ্ডিতেরাই আদরণীয়। এখন বিগত ৪০ বৎসর হইতে এখানকার ছাত্রেরা ন্যায় পড়িতে নবদ্বীপ গমন করিতেছেন। ফলে সমস্ত জগতই বিষয়ে উন্মত্ত হইয়াছে সুতরাং পূর্ব্বে যত আগ্রহে যত ছাত্র বাঙ্গালা হইতে মিথিলায় আসিত এখন মিথিলা হইতে যে সংখ্যক ছাত্র বাঙ্গালায় যায় তাহা তাহার শতাংশের একাংশও নহে। যাহা হউক শাস্ত্র সকল যে অল্প দিনে লোপ হইবে চতুর্দ্দিকে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

(ঘ)

৬৬ ক্রম হইতে।

পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শনান্তর্গত অধিকরণ-মালা [illegible] প্রধান। শ্রীমান্ মাধবাচার্য্য* তাহার প্রণেতা। [illegible]

* মাধবাচার্য্য ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হই[illegible] দেশে ইহাঁর নিবাস ছিল এবং ইনি প্রথমে বিজয়নগ[illegible] ইহাঁর মাতার নাম শ্রীমাধবী ছিল। পিতার নাম অপ্র[illegible] পরিচয় ১৮১ ক্রমে দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রের কর্ত্তা এবং বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ ইঁহারই কৃত। অনেকে ইহাঁকেই বেদান্ত-শাস্ত্রের দ্বৈতবাদ-প্রবর্ত্তক মাধ্বাচার্য্য বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু তাহা ভ্রম। এই দর্শন সম্বন্ধে কয়েক জন গ্রন্থকার মিথিলাদেশেও জন্মিয়াছিলেন। যথা, সুপ্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্ট, যিনি এই দর্শনের এক জন প্রধান বার্ত্তিক-কার। তিনি এই মিথিলাতেই বাস করিতেন, এবং প্রসিদ্ধ বার্ত্তিক-কার মণ্ডন মিশ্র এই দেশেরই ভড়রা-গ্রাম-নিবাসী ছিলেন। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রদীপিকা ও ন্যায়রত্নমালার রচয়িতা পার্থ সারথি মিশ্র, এবং প্রকরণ-পঞ্চিকার গ্রন্থকার শালীনাথ মিশ্র এই প্রদেশেরই নিবাসী বলিয়া কথিত হয়েন। এই শাস্ত্র অতি কঠিন। সমগ্র পাণিনি-ব্যাকরণ, কিয়ৎ পরিমাণ ন্যায়দর্শন, বেদের সংহিতা, পদ, ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে ইহাতে সম্যগধিকার জন্মে না; সুতরাং ভাল করিয়া বুঝা যায় না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে এই বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের অনুশীলন নাই কিন্তু মিথিলাতে এখনও কিঞ্চিৎ আছে। প্রার্থনা করি মিথিলা-রাজ্যের নয়নের জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীমান্ মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত ও দীর্ঘায়ু হইয়া এই সকল শাস্ত্রাধ্যয়নে মিথিলা-রাজ্যে উৎসাহ প্রদান দ্বারা স্বীয় বংশের, দেশের, হিন্দুসমাজের ও শাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১২	প্রমাণ?	প্রমাণ।
১১	২১	সবংচিত	সংরচিত
১৯	২৯	পরিভাষিকী	পারিভাষিকী
২০	১৭	সুত্র	সূত্র
২৪	টিপ্পনী	অন্তনিত্য	অন্ত্যনিত্য
২৭	টিপ্পনী ৫	পুবাণের	পুরাণ
২৭	টিপ্পনী ২১	পমাণুর	পরমাণুর
৫৫	১৯	বিজ্ঞনাত্মা	বিজ্ঞানাত্মা
৭৬	৭	বেদান্তসূত্র	বেদাঙ্গসূত্র
৭৭	১৩	আর আর	আর
৮১	৫	তদ্‌বিরোধী	তদবিরোধী
৮১	৭	তর্কস্যাপ্যভুপেতত্বাৎ	তর্কস্যাপ্যভ্যুপেতত্বাৎ
৮৪	৫	কর্ম্মী	কর্ম্মী,
৮৯	টিপ্পনী	সাধারণ	সাধারণতঃ
১০৩	৫	অব্যপমেশ্য	অব্যপদেশ্য
১১১	টিপ্পনী	পাদত্রয়ের	পাদত্রয়ে
১৩৩	২৩	উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
১৪০	১৪	*	—
১৪২	১৯	তাহা	তাঁহা
১৫২	৮	খল্লিদং	খল্বিদং
১৫২	১২	পদার্থে	পদার্থ
১৫৬	১৯	ব্যাপা	ব্যাপী
১৬১	টিপ্পনী	ভাবে	ভাদ্র
১৬২	টিপ্পনী	ভদ্রে	ভাদ্র
১৬৮	১৪	অধ্যায়নের	অধ্যয়নের